রাসপুটিন

শ্রীমতী শ্যামলী রায়
শ্রীমতী মঞ্জু রায়
সুচরিতাসু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

রোমেল

কমবোডিয়া

দুপুরের খাবার তখন দেওয়া হয়েছে। জার নিকোলাস বসে আছেন জারিনা আলেকজান্দ্রার পাশে। বাইরে ঝলমলে রোদ। গ্রীষ্মের দুপুর। মৌসুমী ফুল ফুটে আছে এখানে সেখানে।

আসন্ন এক সম্ভাবনায় জার এবং জারিনা অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন। দিন এগিয়ে আসছিল। জার পরিবারে যিনি আসছেন তিনি কি হবেন! এবারও কি মেয়ে! ওলগা, আনাস্তাশিয়া, নাতাশিয়ার পর এবারও কি কোন মেয়ে, নাকি ভবিষ্যৎ জার!

সময়টা হঠাৎ এগিয়ে এল। সবে স্যুপে চুমুক দিয়েছেন জারিনা আলেকজান্দ্রা এমন সময় আচমকা তলপেটের ব্যথাটা বেড়ে উঠল। কপালে ফুটে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। জার নিকোলাস লক্ষ্য করলেন। তিনি ঝুঁকে তাকালেন আলেকজান্দ্রার দিকে। আলেকজান্দ্রা ইঙ্গিতে বোঝালেন—তার আসার সময় হয়েছে, সে আসতে চাইছে। আলেকজান্দ্রা নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন।

তার ঠিক একঘণ্টা পরে পেট্রফের অলিন্দ থেকে তোপধ্বনি করা শুরু হল। রাশিয়ায় দ্রুত খবরটা ছড়িয়ে পড়ল, জার এবং জারিনা এক পুত্রসন্তান করেছেন। ভবিষ্যৎ জারের ওজন হয়েছে আট পাউণ্ড, এবং সে ভাল আছে।

মাত্র ছ'টি সপ্তাহ নিরুদ্বিগ্নভাবে উপভোগ করতে পেরেছিলেন জার নিকোলাস। তারপরই শঙ্কার ডঙ্কা বেজেছিল তাঁর বুকে। প্রথমে লক্ষ্য করেছিলেন জারিনা আলেকজান্দ্রা। শিশু আলেক্সির নাভি

থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। খবর গেল নিকেলাসের কাছে। নিকোলাস এলেন, দেখলেন, চমকে উঠলেন।

একি হেমোফিলিয়া! রাজপরিবারের সেই অভিশপ্ত অসুখ! কিন্তু কেমন করে? রাশিয়ায় কারও তো এ রোগ কখনও হয়নি! তবে কি অকারণ আশঙ্কা! খবর গেল সার্জেন ফেডরোভ এর কাছে। ফেডরোভ খুব ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন। সকাল থেকে শুরু হয়েছে। মাঝে মধ্যে থেমেছে। কিন্তু রক্তপড়া একেবারে বন্ধ হয় নি। নাভি চুঁইয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ফেডরোভ নাভিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন। বললেন, এখনও তেমন চিন্তার কিছু নেই। দেখুন না কাল দিনটা কেমন যায়।

সেই রাতে ঘুম ছিলনা জার এবং জারিনার চোখে। অনেক প্রতীক্ষার পর সে এল। কিন্তু আসবার মাত্র কিছুদিন পরেই একি দুর্বিপাক। এতটুকু শিশুর শরীরে কত রক্তই বা থাকে!

সকালে দেখা গেল ব্যাণ্ডেজে রক্তের লাল দাগ। কিন্তু খুব বেশী জায়গায় নয়। রক্তপাতের পরিমাণ কমেছে। দেখতে দেখতে সকাল গড়িয়ে দুপুর এল। দুপুরে একেবারে থেমে গেল রক্তপড়া। ছোট্ট আলেক্সি হাত পা ছুড়ে নিজের মনে খেলায় মত্ত—যেমন একটি স্বাস্থ্যবান একমাসের ছেলে করে থাকে, তেমনি।

দেখে আশ্বস্ত বোধ করলেন জার। হয়তো তবে ব্যাপারটা সামান্যই। হয়তো তেমন গুরুতর কিছু নয়।

হেমোফিলিয়ার আক্রান্ত সবচেয়ে বিখ্যাত পরিবারের নাম—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরিবার। মহারাণীর সব ছিল—বিরাট সাম্রাজ্য, পূর্ণ রাজকোষ, অনুগত কর্মচারী—সবই। শুধু ছিলনা পারিবারিক শান্তি। যাঁকে তিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন সেই যুবরাজ লিওপোল্ডই তাকে দিয়েছিলেন তীব্রতম মানসিক আঘাত। অবশ্য লিওপোল্ড

নিজে তার জন্য দায়ী ছিলেন না। অদ্ভুত এক রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর নাভি থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়তো। কখনও অবিরত কখন বিরতিসহ। ডাক্তাররা মহারাণীকে জানিয়ে ছিল, নাভি থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়া একটি রোগের লক্ষণ, তার নাম হেমোফিলিয়া। এই রোগ রক্তের গভীরে লুকিয়ে থাকে, ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যেও সংক্রামিত হতে পারে।

পাঁচ মেয়ের মধ্যে দুটি মেয়েও এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাদের নাম রাজকুমারী এলিস ও বিয়াত্রিস। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুখের সংসারে তখন দৈব দুর্বিপাকের উত্তাল ঝড়।

মহারাণী বিশ্বাস করতে পারেন নি। খবর পেয়ে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তারপর করেছিলেন প্রতিবাদ। —না। হতে পারেনা। আমাদের পরিবারের কেউ কখনও হেমোফিলিয়ার আক্রান্ত হয় নি। এখনও হতে পারে না।

এবং তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ইচ্ছাই ছিল আদেশ।

প্রকাশ্যে অস্বীকার করলেও প্রিন্স লিওপোল্ডের জন্ম মুহূর্ত্তের পর থেকেই যে শরীরে নানা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে তার খবর মহারাণী রাখতেন। আঠারোশো আটষট্টি সালের ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের দিকে তাকালেও দেখা যাচ্ছে যে,প্রিন্স লিওপোল্ড তখন সবে পনেরোয় পা দিয়েছেন, তার প্রতি মাসেই রক্তপাত হয়, হাঁটুতে দুর্বলতা লেগেই আছে এবং আকস্মিক রক্তপাতের জন্য তিনি ভীষণ দুর্বল বোধ করছেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রিয় পুত্রের এই অসুস্থতার জন্য চরম বিত্তের মধ্যে পরম রিক্ত বোধ করছিলেন। লিওপোল্ডকে সব সময় আগলে রাখতে চাইতেন, চোখে চোখে রাখতে চাইতেন, এবং অতিরিক্ত স্নেহ দেখাতেন। ভিক্টোরিয়া সবই দিয়েছিলেন লিওপোল্ডকে। শুধু দিতে পারেন নি হেমোফিলিয়া থেকে নিরাময়ের নিরাপত্তা।

উত্তরাধিকার সূত্রে আলেকজান্দ্রাও ধমনীতে অজান্তে বইছিলেন সাঙ্ঘাতিক হেমোফিলিয়ার ভবিষ্যৎ বীজ। খুল্লতাত, ভাই, ভাইপোদের মধ্যে যে রোগের প্রকাশ ঘটেছিল, রাজকুমারী আলেকজান্দ্রাও তা থেকে মুক্ত ছিলেন না। ভিক্টোরিয়া পরিবারের পারিবারিক দুর্দৈবের শরীক হওয়া ছিল তার নিশ্চিত নিয়তি।

ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা ছিল। আঠারোশ ছিয়াত্তরে বিখ্যাত ফরাসী ডাক্তার গ্রান্দিফিয়ার লিখেছিলেন, রক্তপাত অবিরত ঘটে এমন কোন পুরুষ বা নারীকে দেখলে তাদের জানানো উচিত, তোমরা বিয়ে করনা। তোমাদের রক্তের গভীরে প্রবাহিত হচ্ছে এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশ, তার নাম হেমোফিলিয়া। বংশানুক্রমে তা সংক্রামিত হতে পারে। পরিণামে পাবে মৃত্যুশোক, দুর্বল স্বজন এবং নিত্য উদ্বেগ।

আলেক্সির অসুস্থতার পর থেকে জারিনা আলেকজান্দ্রা প্রাসাদের বৈভব অনুষ্ঠান থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনকে সঙ্গী করে নিয়েছিলেন।

আনন্দের দিন ছিল শুধু সেই সময়টুকু যখন আলেক্সির রক্তপাত বন্ধ থাকত, আলেক্সি হৈ চৈ বাধিয়ে প্রাসাদে আনন্দের কলতান তুলত। ছোট্ট আলেক্সি ছিল সকলের নয়নের মণি। তার সোনালী চুল, গভীর নীল চোখ, গোলাপের মত গায়ের রং, দেবশিশুর মত হাসি, সব বিষণ্ণতা মলিনতাকে মুহূর্তে দূর করে দিত।

টালমাটাল পায়ে আলেক্সি ছুটে বেড়াতে চাইত। আলেকজান্দ্রা শঙ্কায় অস্থির হতেন, আগলে রাখতে চাইতেন, কিন্তু দামাল ছেলে নাগাল এড়িয়ে খেলতে ভালবাসত অনেক বেশী।

হেমোফিলিয়ার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল, রক্ত দীর্ঘ সময় ধরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষদের মত জমাট বেঁধে যায় না। জোরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে হয়ত রক্ত বন্ধ করা যেত। কিন্তু নাকে, মুখে

যদি রক্তপাত সুরু হয় তখন আর কোন পথ থাকে না। অবিশ্রান্তভাবে রক্ত পড়ে। মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়ায়। আলেকজান্দ্রা সেই ভয়ই পেতেন। আঘাত থেকে দূরে রাখতে চাইতেন অসুস্থ তনয়টিকে।

আলেক্সির সবচেয়ে দুঃসহ ও দীর্ঘমেয়াদী যন্ত্রণা দেখা দিল দুই হাড়ের সন্ধির মধ্যে রক্তক্ষরণের ফলে। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যেত না। রক্ত শিরা বেয়ে গড়িয়ে আসত কনুই, হাঁটু বা গোড়ালীতে। প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হত সেখানে। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠত আলেক্সি। কখনও কখনও ভোর বেলা বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় আলেক্সি ডেকে বলত, মা আমার কনুই ভাঁজ করতে পারছিনা কেন? কখনও হাঁটার জন্য পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়াত। পা চলতনা। হাঁটু শক্ত হয়ে থাকত। আলেক্সি দুহাতে হাঁটু চেপে ধরে বলত—মা, আজ আমি হাঁটতে পারছিনা কেন? বেলা বাড়ত, সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাও। অথচ কোন ওষুধ নেই মরফিয়া দেওয়া ছাড়া। মরফিয়াও প্রতিদিন দেওয়া চলেনা; ক্রমাগত মরফিয়া ব্যবহার করলে হিতে বিপরীতও হতে পারে। যন্ত্রণা পেতে পেতে আলেক্সি এক সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ত। অজ্ঞান হলেই আলেক্সি যন্ত্রণা থেকে কিছুটা মুক্তি পেত।

নিষেধ ছিল, জোরে ছুটোনা, বেশী লাফালাফি কোরনা, হোঁচট খেয়োনা। নিষিদ্ধ সেসব খেলার মধ্যেই আবার আলেক্সির ছিল তীব্র অনুরাগ। বাইসাইকেল ছোট্ট আলেক্সিকে আকৃষ্ট করতো। প্যাডেলে চাপ দিলেই কেমন এগিয়ে যায়। এ যেন বসে বসে বাতাস কেটে এগিয়ে যাওয়া। আলেক্সি বায়না ধরত, মা সাইকেল চড়ব।

আলেকজান্দ্রা ঘাড় নাড়তেন, না, তা হয়না। তুমিত জান কেন? আলেক্সি অল্প অল্প বুঝতে পারছিল—কাঁচের মত তার শরীরটাকেও আগলে রাখতে হবে। আঘাত পেলে বড় ব্যথা, বড় যন্ত্রণা। সে আর সকলের মত দেখতে হলেও আর সকলের মত নয়।

কখনও বাবার কাছে আবদার করত, বাবা আমি টেনিস খেলব। নিকোলাসের বলতে ইচ্ছা করত, হ্যাঁ, নিশ্চয়। কিন্তু মুখে বলতে হত, না। কেন না, তাত তুমি জান।

বড় দুঃসহ ছিল সেই মুহূর্ত্তগুলি যখন ছোট আলেক্সির উজ্জ্বল বর্ণ প্রচণ্ড যন্ত্রণায় পাণ্ডুর দেখাত। মা হয়ে বড় ইচ্ছা হত আলেকজান্দ্রার কিছু একটা করতে যাতে আলেক্সির ব্যাথা কমে, উপসম হয়। অথচ করার কিছু ছিলনা। অসহ্য যন্ত্রণায় আলেক্সি যখন আর্ত্তনাদ করত, মা, আমাকে বাঁচাও। এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচাও। আমি আর সহ্য করতে পারছিনা—তখন আলেজান্দ্রার বুকের মধ্যে কে যেন গরম সীসে ঢেলে দিত, চোখ ফেটে কান্না আসতে চাইত। গভীর স্নেহে আলেক্সির কপালে হাত রেখে শুধু বলতেন, ধৈয্য ধরো, একটু ধৈর্য্য ধরো বাছা, দেখো ঠিক সেরে যাবে।

অন্য কোন রোগ হলে তা সেরেও যায়। কিন্তু আলেকজান্দ্রার কাছে হেমোফিলিয়ার স্মৃতি বড় ভয়ানক। তার বয়স যখন মাত্র এক বছর তখন এই রোগে মারা গিয়েছিল সহোদর ফ্রিটি। যখন বয়েস বারো তখন সে দেখছে একই রোগ চিরদিনের জন্য নিয়ে যাচ্ছে খুল্লতাত লিওপোল্ডকে। হেমোফিলিয়ায় মৃত্যু সেখানে যতি টানেনি গতিতে। আলেক্সির জন্মের কিছুদিন আগে মাত্র চারবছর বয়সে প্রিন্স হেনরি বিদায় নিয়েছিলেন পৃথিবী থেকে। এবং ততদিনে নির্দ্ধারিত ভাবে জানা গেছে, রাজবংশের রক্তের গভীরে বয়ে চলেছে এক ভয়ানক সর্বনাশ। এবং তাতে আক্রান্ত অনেকেই। কখনও গভীর রাতে কখনও বা দিনের আলোকে সেই সব মৃত মুখগুলো সহসা ভেসে উঠত চোখের সামনে। আলেকজান্দ্রার শঙ্কা বাড়ত আরো।

ঘুমন্ত আলেক্সির নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে আলেকজান্দ্রার

মনে হত, তাই কি ? সে কি হতে পারে ? এমন সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখে মৃত্যু কি তার পাণ্ডুরতা মাখাতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে উঠতো বেজে গুরু গুরু। এ'গুরু গুরু ডাক শুধু মায়েদের বুকেই বাজে।

সবার হয়, আলেকজান্দ্রারও তাই হয়েছিল। হেমোফিলিয়ায় আক্রান্ত সব মা'ই খোঁজে এমন একজন ডাক্তারকে যে নিশ্চিত বরাভয় দিয়ে বলতে পারবে, চিন্তা করনা। মৃত্যুর শিয়র থেকে জীবনকে আমরা ছিনিয়ে আনি। এ ও ভাল হবে। আরোগ্যের আনন্দ হবে এর এক স্বাভাবিক অনুভূতি। —আলেকজান্দ্রাও এত্তেলা পাঠিয়েছিলেন একের পর এক ডাক্তারকে। প্রত্যাশা নিয়ে ডাক্তাররা এসেছেন। নিরাশায় মাথা নেড়ে ফিরে গিয়েছেন। প্রতিবারই আলেকজান্দ্রা আশায় বুক বেঁধেছেন, প্রতিবারই কঠিন সত্যের নিদারুণ যন্ত্রণায় ভেঙ্গে গিয়েছে বুক। পরিণামে আলেকজান্দ্রা আত্মসমর্পন করেছিলেন সকল বিশ্বাসের আধার প্রভু যীশুখৃষ্টের কাছে।

অলৌকিক, একটা অলৌকিক কিছু ঘটুক। শিশু আলেক্সির সব অসুখ কোন এক অজানা মন্ত্রবলে কিংবা দৈববলে মুহূর্তে অপসারিত হক—যীশুখ্রীষ্টের মূর্ত্তির সামনে বসে আলেকজান্দ্রা করুণ মিনতি জানাতেন। ক্রমশ প্রার্থনার প্রহর বাড়তে লাগল। কখনও এক নাগাড়ে তিনচার ঘন্টা। কখনও এরকম প্রার্থনা দিনে তিন চারবার। লৌকিক কোন কিছু নয়, নিজের জন্য কিছু নয়, আলেকজান্দ্রার প্রার্থনা ছিল শুধু শিশু আলেক্সির আরোগ্যের জন্য।

প্রথমে শুরু হয়েছিল নিজের ঘরে, তারপর প্রাসাদের চ্যাপেলে, সব শেষে গোপন নিভৃত নতুন চ্যাপেলে যীশুর মূর্ত্তির সামনে প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসে থাকতেন আলেকজান্দ্রা।

যখন আলেক্সি সুস্থ থাকত, নিজের মনে হাসি খুশিতে ভরে থাকত, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন আলেকজান্দ্রা। প্রভুর মূর্ত্তির সামনে বসে তার চোখ বেয়ে কৃতজ্ঞতার জল নেমে আসত। অস্ফুটে উচ্চারণ করতেন, প্রভু তুমি শুনেছ, সাড়া দিয়েছ।

আলেকজান্দ্রা বিশ্বাস করতেন, মঙ্গলময় নিশ্চয় তাকে ত্যাগ করবেন না ; তার কথা শুনবেন। যখন তিনি জানতে পারলেন, তার মাধ্যমেই হেমোফিলিয়া আলেক্সির শরীরে সংক্রামিত হয়েছে তখন তিনি বললেন, আলেক্সির অসুস্থতার জন্য যেমন আমি দায়ী, তেমনই তাকে সুস্থ করে তোলায় পূর্ণ দায়িত্বও আমারই।

বুকের গভীর গহনে দুঃখের ভার থাকলে এমন কোন বান্ধব দরকার যার কাছে অনায়াসে বলা যায় সব কথা, তাতে দুঃখ কমে, মনের ভার লাঘব হয়। আলেকজান্দ্রার দুর্ভাগ্য তেমন বান্ধবীর সংখ্যা তার নগণ্য ছিল। নিয়মিত ছিল কিছু অনুষ্ঠান, নিয়মিত ছিল জার ও জারিনার সে সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন। উৎসবমুখর আলোকিত সেই প্রহরগুলিতে প্রায় প্রাত্যহিক নিয়মে হত নাচ কিংবা গান কিংবা খানাপিনা। মুখে হাসির মুখোশ এঁটে ভেতরে ভেতরে তিতি বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন আলেকজান্দ্রা। একঘেয়েমি মনে হত সবকিছু, অথচ বুকের কথা মুখ ফুটে বলা যায় না কাউকে। নিকোলাস অনুগত স্বামী। আলেকজান্দ্রার সত্য ভাষণ তাকে ব্যথিত করতে পারে। তাই বলা আর হয়না। ম্যারি বেরিয়াটিনস্কিকে লেখা এক চিঠিতে সেই অভিব্যক্তিই ধরা পরে,—ভালো লাগে না, ভালো লাগে না আর আলোকিত আনন্দ উৎসবে জনতার স্রোত কিংবা চটুল কথা, এর চেয়ে অনেক ভাল লাগে অন্যের ভাল করতে, ভাল করতে পারার কথা ভাবতে। আর সেইত আমার জীবনের স্বপ্ন।

ব্যাতিক্রম ছিল আনা ভিরুবোভা, নিয়তি তাড়িত এই রমণী এক সুখী গৃহকোণের স্বপ্ন দেখেছিলেন সন্থ যৌবনে। চেহারায় তার মদিরতা ছিলনা, ছিল সারল্যের পেলবতা। বিয়ে হয়েছিল উজ্জল তরুণ যুবক আলেকজাণ্ডার ভিরুবোভার সঙ্গে। এই বিয়েতে বিশেষ ভূমিকা ছিল আলেকজান্দ্রার। কিন্তু রাজ অনুগ্রহও ধরে রাখতে পারেনি বন্ধনকে। কয়েকমাসের মধ্যেই আনার ছাড়াছাড়ি হল আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে। তার আহত মনে শান্তির প্রলেপ লাগাতে এগিয়ে এলেন

জারিনা। দুজনের বন্ধুতে চির খায় নি কখনও, আলেকজান্দ্রা যেমন জানতেন আনার মনের সব কথা, তেমনি আনাও জানতেন আলেকজান্দ্রার সব কথা।

আনা ভিরুবোভাও গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন প্রিয়তম বান্ধবীর একমাত্র তনয়ের ভয়ঙ্কর অসুখের খবর শুনে। একদিনের কথা তিনি লিখেছেন—পাশাপাশি বসে বেড়াতে যাচ্ছিলাম আমরা, আমি আমার পাশে আলেক্সি তার পাশে জারিনা আলেকজান্দ্রা। বালির রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছিল গাড়ী। হঠাৎ আলেক্সি বলল, মা ঝাঁকি লাগছে। তারপর বলল, পায়ের তালুতে, তলপেটে ব্যথা হচ্ছে, তারপর থেকে প্রতিটি ঝাঁকুনিতেই আলেক্সি চিৎকার করে উঠতে লাগল যন্ত্রণায়। আলেকজান্দ্রা ভয়ে দিশাহারা হল। আমরা কোন রকমে ফিরে এলাম। মাত্র কিছু সময়, কিন্তু এত যন্ত্রণাময় আর কখনও বোধ করিনি।

সেই নিদারুণ ভ্রমণের খবর পেয়ে ছুটে এলেন নিকোলাস, তলব গেল প্রসাদের ডাক্তার বটকিন এর কাছে। বটকিন আলেক্সিকে পরীক্ষা করে চমকে উঠলেন, তার কপালে ভাঁজ পড়ল। আলেক্সির থাইতে রক্ত জমছে, ব্যথা বাড়ছে, অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে। নিকোলাস সব শুনলেন, তারপর সেই রাতে একের পর এক টেলিগ্রাম পাঠান হল স্পালা থেকে। ডাক্তারদের কাছে খবর গেল,—তাড়াতাড়ি চলে এস, জরুরী।

তারা এলেন, একে একে।

তখন আলেক্সি জ্বরের ঘোরে নিজের মনে কথা বলছে। পর পর পাঁচদিন অবস্থা অপরিবর্তিত রইল। আলেক্সির শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল, রক্ত জমে ব্যথা বাড়ছিল। ডাক্তাররা সাধ্যমতো চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু উপসমের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না।

রাশিয়ার ঘরে ঘরে খবর গেল, প্রার্থনা কর, সকলে প্রার্থনা কর

রাশিয়ার ভাবী জারের আরোগ্যের জন্য, সে গুরুতর পীড়িত,—দূর দূরান্তে গীর্জাতেও প্রার্থনা জানান হল,—হে পরমপিতা, যুবরাজকে রোগমুক্ত কর।

গীর্জায় গীর্জায় যখন প্রার্থনা করা হচ্ছে তখন জারের প্রাসাদের একটি ঘরে মৃত্যু যন্ত্রণায় একটি বালক মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছিল। পিতা নিকোলাস একবার ঘরে ঢুকে সেই যন্ত্রণার দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে চলে গেলেন। শিয়রে স্থানুর মত দাঁড়ানো আলেকজান্দ্রা, তার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি শেষ। ছোট্ট বুকের শেষ ধুকপুকিটুকুও বোধহয় থেমে গেল একেবারে।

সেই রাত্রিতে আশাহত আলেকজান্দ্রা আনা ভিরুবোভাকে বললেন—সব আশাই তো শেষ, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ। সাইবেরিয়ার পোকরোভস্কিতে খবর পাঠাও রাসপুটিনের কাছে। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মানুষটিকে বল আলেক্সির জন্য প্রার্থনা করতে, বল। আমি তার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

টেলিগ্রামের উত্তর খুব তাড়াতাড়ি এল। রাসপুটিন লিখেছেন, মঙ্গলময় তোমার চোখের জল ও মনের প্রার্থনা শুনেছেন। দুঃখ করনা। আলেক্সি বেঁচে উঠবে। শুধু দেখো ডাক্তাররা যেন তাকে না জ্বালায়।

তার একদিন পরে অবিশ্বাস্যভাবে আলেক্সির রক্তপড়া বন্ধ হল।

আঠারোশো বাহাত্তর সালে দক্ষিণ সাইবেরিয়ার তুরা নদীর তীরে পোকরভস্কি গ্রামে একজন কৃষকের ঘরে যে ফুটফুটে নবজাতকটির চোখে পৃথিবীর প্রথম আলোর ছটা লাগে তার নাম গ্রেগরী এফিমোভিচ। যৌবনে তার নাম হয়েছিল রাসপুটিন।

পিতা এফিমের কাছে প্রতিটি দিনই ছিল সংগ্রামের দিন, প্রতিকুল ছিল সব কিছু—আবহাওয়া, জমি, বরফপাত। জমি শক্ত, অথচ কৃষককে ফসল ফলাতে হলে সেই জমিকেই কুপিয়ে নিতে হবে, একটানা কাজ করাও মুস্কিল, ঝোড়ো হাওয়া লেগেই থাকতো। সে কি শুধুই ঝোড়ো হাওয়া। উত্তাল টালমাটাল ঝড়ও ছিল নিত্য সহচর, শীতে বরফ দাঁত বসাতো রাস্তায়, জমিতে, বাড়ীর ছাদে, শরীরে। দিনের উত্তাপ কমতে কমতে চাপ চাপ ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে উঠতো শরীর। শূন্যেরও নীচে চল্লিশ ডিগ্রি নেমে যেতো দিনের উত্তাপ কখন সখন। অথচ চারদিকে তাকালেই চোখ ঠিকরে যেত ধাঁধাঁ, লাগত ধু ধু বরফে, কাজ আর করা যেত না। কাজ না করলে কৃষকের চলে না। এই সময়টা ছিল এফিমের বড় দুঃখের।

নিঃসঙ্গ সেই দিনগুলিতে এফিমের সব চেয়ে আ[illegible]দকর অনুভূতি ছিল শিশু গ্রেগরী এফিমোভিচ এর সংসর্গ। দরিদ্র পিতা মাতার কুটিরে ছোট্ট শিশুটির চোখের দিকে তাকালে তাদের মনের সব রিক্ততা মুহূর্ত্তে পূর্ণতায় পরিণত হত। শিশুর নীল চোখে যেন অস্পষ্ট কুয়াশার ছায়া। হাসলে সে চোখে বিদ্যুৎ খেলে। মাঝে মাঝে আনমনে সেই চোখই আবার উদাস হয়ে যেত।

তখন কতই বা বয়স। কথা ফুটেছে মাত্র কিছুদিন আগে। খেলাধূলা দৌড়ঝাঁপে কাটে সময়। ভেড়ার পালের পেছনে লাল জামা পরে ছুটে যায় গ্রেগরী, এফিম দূর থেকে দেখেন। যেন নিজের

ছোটবেলাকেই দেখেন ছুটে বেড়াচ্ছে। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন। দিন যায়। বছর যায়। গ্রেগরী বারতে পা দিল দেখতে দেখতে।

গ্রেগরীর একদিন জ্বর হল। এরকম জ্বর কিংবা শরীর খারাপ সব ছোট ছেলেমেয়েরই হয়। গ্রেগরী বিছানায় শুয়ে। গায়ে চাদর ঢাকা। সামনে বসে এফিম, কয়েকজন গ্রামের লোকের আসবার কথা ছিল, তাদেরই জন্য অপেক্ষায়।

একটু পরে তারা এল। সব মুখই চেনা। সব মুখই থমথমে। তাদের মধ্যে একজন বলল,—কেমন করে এটা হতে পারে? এই গ্রামে সবাই সবাইকে জানে। কার এত সাহস আছে?

আর একজন বলল, কিন্তু ঘোড়াটা নিয়ে গেল কি করে? চুরি করে নিতে গেলেও কেউ না কেউ তো দেখেই ফেলবে।

এফিম বলল, ঘোড়াটা যে চুরি গেছে এতে তো কোন সংশয় নেই।

শিশু গ্রেগরী ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে একটা ঘোড়া চুরি হয়েছে। হঠাৎ সে উঠে বসল। তার নিঃশ্বাস খুব দ্রুত পড়ছিল। গালে চিবুকে উত্তেজনায় দেখা দিল রক্তাভ আভা। ঘরের সকলের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, আমি জানি, আমি জানি কে ঘোড়া চুরি করেছে।

এফিমের চোখে বিরক্তিব চিহ্ন ফুটে উঠল। এতজন বয়স্ক মানুষের সামনে বসে কেন কথা বলছে গ্রেগরী। একি অসভ্যতা! মুখে বলল, তার মানে?

গ্রেগরী অবিচল ভাবে এফিমের দিকে তাকাল। তারপর স্পষ্ট-ভাবে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল, তোমরা তো চোরকে খুঁজছো। তোমাদের ঘোড়া-চোর ঘরেই আছে।

যারা ঘরে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যেকেই বিস্মিত বোধ করলেন। এতটুকু ছেলে এত [illegible] আত্মবিশ্বাসের স্বরে কথা উচ্চারণ করে কি ভাবে! একজন এগিয়ে এসে বললেন, বেশতো, তুমি যদি জানই যে কে ঘোড়া চুরি করেছে তো [illegible], কে করেছে। আমি?

গ্রেগরী ঘাড় নাড়ল। না, আপনি না। ঐ যে বসে আছেন, উনিই ঘোড়া সরিয়েছেন।

যে লোকটির দিকে গ্রেগরী আঙুল তুলেছিল সে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। এফিম কেন একটি ছোট ছেলেকে এমন হঠকারী কথা বলতে দিয়েছে, তার জন্যও ধিক্কার দিল। এফিমের এত গঞ্জনা সহ্য হল না। সে উঠে গিয়ে অসুস্থ গ্রেগরী গালে পিঠে এলোপাথারী মার দিল। গ্রেগরী মার খেয়ে কাঁদল। কিন্তু কাঁদতে কাঁদতেও বলল,—আমাকে কেন মারছ। আমি বলছি, দেখো ওই চোর।—এরপর আর আলোচনা চলার মত পরিবেশ ছিল না। সভা ভেঙ্গে গেল একটু পরেই।

সেদিন নিশুতি রাত্রে গ্রামের তুজন লোক নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছিল। রাত্রির অস্পষ্ট আলোকে তাদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। তাদের একজন আর একজনকে বলছিল, গ্রেগরীর কথা সত্যি হোক বা না হোক, চলনা একবার সার্বোভিচ এর বাড়ী, গিয়ে দেখি সত্যি সত্যিই ঘোড়া আছে কিনা।

দ্বিতীয় জন বলল, আমারও কথাটা অনেকক্ষণ ধরেই মনে এসেছে। চল দেখেই আসি। তারা তু'জনে সার্বোভিচ এর বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

ঠিক তখনই সার্বোভিচ ঘোড়াটাকে নিয়ে বনের দিকে রওনা হচ্ছিল চুপিসারে। তারা তু'জনে হঠাৎ সামনে হাজির হয়ে বলল, কি কোথায় যাচ্ছ এত রাতে ঘোড়াকে নিয়ে ?

দ্বিতীয় জন ঘোড়াটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সবিস্ময়ে বলল, একি, এখন দেখছি গ্রেগরীই ঠিক বলেছিল। এইতো সেই ঘোড়া।

পরদিন সকালে গ্রামের সকলে জানতে পেরেছিল বার বছর বয়সের গ্রেগরীর অসামান্য অলৌকিক ক্ষমতা আছে। সে যা বলেছিল তাই সত্যি। ঘোড়া চোর ধরা পড়েছে।

গ্রেগরীর তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাই তাকে পরে রাসপুটিন নামের কিংবদন্তী এনে দিয়েছিল।

রাসপুটিনের চেহারায় পৌরুষের চিহ্ন ক্রমশ ফুটে উঠতে লাগল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার চরিত্রের জন্য গ্রামবাসীর উৎকণ্ঠা বেড়েছিল ভয়ানক রকম। এফিমের কাছে খবর আসত নানাজনের কাছ থেকে। সবই অভিযোগ। রাসপুটিন বড্ডবেশী নারী আসক্ত! মেয়ে দেখলেই সে অস্থির উদ্দাম হয়ে ওঠে। রাসপুটিনের সুঠাম শরীরের দিকে তাকিয়ে এফিম ভাবতেন, এর দাওয়াই মাত্র একটিই। তা হোল, একটি স্বাস্থ্যবতী তরুণীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া। কিন্তু বিশ বছর বয়স হওয়ার আগে রাসপুটিনের তো আক্কেলই হবে না। ততদিন পর্য্যন্ত অন্তত অপেক্ষা করতে হবে।

অল্প বয়সেই গ্রেগরী পিপের মত মদ খেতে পারত। কিশোরের স্বভাবসুলভ সংকোচ বা লজ্জা তার ছিল না। যেমন করে একজন মানুষ বলে, আমার জল তেষ্টা পেয়েছে কিংবা ক্ষিধে পেয়েছে, তেমন করেই সে যে কোন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলত, কি শোবে নাকি একটু?

কেউ ছুটে পালাত! কেউ শঙ্কায় অধীর হত। কেউ বা আবার ধরাও দিত। রাসপুটিন সময় নষ্ট করতো না। একগাল হেসে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় কথার পরই তার হাত চলে যেত মেয়েদের জামার বোতামে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রহাতে সে এক এক করে সব বোতাম নিমেষের মধ্যে খুলে ফেলতে পারত। মেয়েদের মধ্যে অনেকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো, আঁচড়ে দিত, কামড়ে দিত, লাথি মারত। তারি মধ্যে রাসপুটিন বুঝতে পারতো, এতো রাগের ভেতরেও একটা চাপা অনুরাগ আছে। পোকরভস্কির উদাসীন নির্জনতায় দেহের খেলায় লাজুকতমা মেয়েটিরও হৃদয়ে ক্ষনিক আবেশ আসে, রাসপুটিন তাই দমত না। অদম্য কামনায় অহরহ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করতো একে ওকে তাকে।

একটা জীবিকাও দরকার। শুধু একিমের আয়ের ওপর নির্ভর করে থাকা চলে না। তারও চেয়ে বড় কথা, শক্ত সমর্থ ছেলে বিনা আয়ে শুয়ে বসে দিনই বা কাটায় কেমন করে। কিন্তু তাই বলে চাষবাস? না, নিজের টানটান দেহের ছায়ার দিকে তাকিয়ে রাসপুটিন তার জীবিকার উপায় স্থির করে ফেলেছিল।—চওড়া কাঁধে মাল তুলে নেব। পৌঁছে দেবো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। অসুস্থ মানুষ কিংবা শিশুকে কাঁধে করে পৌঁছে দেব।—যে যেখানে যেতে চায়। পরিশ্রমের জোয়াল কাঁধে নেব—অবশ্যই রজতকাঞ্চনের বিনিময়ে।

আসা যাওয়ার পথের ধারে আলাপ হত কত জনের সঙ্গে। বাকপটু রাসপুটিন খুব সহজেই বড় আপন করে কথা বলতে পারত সবার সঙ্গে। তার চোখ অতিরিক্ত উজ্জ্বল, একজন স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক অনেক বেশী উজ্জ্বল। অনায়াস অবহেলায় যে ভাবে সে মাল বহন করত তাতে বিস্মিত হত অনেকেই। আর তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমিয়ে ফেলা ছিল রাসপুটিনের অভ্যাস।

এরকমভাবেই সে একদিন পেয়ে ছিল ভারখোতুরীর সন্ধান। একজন এসে বলেছিল, কি হে আমাকে ভারখোতুরীতে নিয়ে যাবে?

—নিয়ে যাবার জন্যই তো আমি আছি। বলুন কতক্ষণে যেতে চান।—জবাব দিয়েছিল রাসপুটিন।

—কতক্ষণে.. খিক খিক করে হেসেছিল লোকটি।—কতক্ষণে মানে? যতক্ষণে তুমি নিয়ে যেতে পারো।

যাওয়ার পথে রাসপুটিন লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা,— ভারখোতুরীর ব্যাপারটা কি বলুনতো?

—ব্যাপারতো কিছু নয়। ওটা একটা মনেষ্টারি। ধর্মের আখড়া। লোকটি জবাব দিয়েছিল।

—ওখানে কি হয়?

—ওখানে? ধর্মের অভ্যাস হয়। দেহের শান্তি, আত্মার শান্তি হয়।

—দেহের শান্তি?—রাসপুটিনের চোখ চকচক করে উঠেছিল।

লোকটি হেসেছিল, হ্যাঁ। দেহের অশান্তিতে কি মনের শান্তি আসে?

হঠাৎ রাসপুটিন বলল, আচ্ছা আমি ওখানে থাকতে পারি? মানে আমাকে থাকতে দেবেন?

লোকটি মৃদু হাসল। বলল, নিশ্চয়ই থাকতে পার। ঈশ্বরের দরজা, সেত সকলের জন্যই খোলা। এই দরজা দিয়েই তুমি সেই মঙ্গলময়ের কাছে পৌঁছতে পারো। অবশ্য তোমাকে তার আগে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

রাসপুটিন তার সঙ্গে সেই যে মনেষ্টারিতে ঢুকেছিল, সেখান থেকে বের হয়েছিল চার মাস বাদে।

মঠে জীবন রাসপুটিনের খুব মজাদার লাগছিল। ভারখোতুরীর মধ্যে যারা ছিল তারা বিশ্বাস করত কামনা যতক্ষণ শরীরে থাকে ততক্ষণ শরীরে বাসনা আস্তানা গাড়ে। এদের নির্মূল না করতে পারলে মন কখনও একাগ্র হয় না। তাই কামনাকে জয় করতে হবে। আর কামনাকে জয় করার একমাত্র পথ হল, অবদমিত কামনাকে চরিতার্থ করা।

শনিবার রাত্রিটি নির্দ্ধারিত ছিল ঈশ্বর উপাসনার জন্য। সেদিন পর্দাঘেরা বাড়ী কিংবা গাছ ঘেরা বনে একে একে এসে পৌঁছত গায়কেরা! হাতে তাদের মোম। প্রত্যেকের পরণে ধবধবে সাদা লিনেনের গাউন। মোমবাতি জ্বালিয়ে তারা গান গাইতে সুরু করতো। গাইতে গাইতে নাচ। মোম পুড়ে গলে গলে পড়তো। যত সময় কাটতো, মোমবাতির শিখা নিভু নিভু হয়ে আসতো নাচ তত উদ্দাম হয়ে উঠতো। শরীরে বইতো কামনার ঝড়। তাদের শরীর থেকে

জামা কাপড় খুলে যেত। পৃথিবীর প্রথম মানব ও মানবীর মত পোষাকে তারা একে অন্যকে আকর্ষণ করত, নারী পুরুষকে। বয়সের বাছ-বিচার ছিলনা, ছিলনা কোন নির্বাচনের ব্যাপার। উদ্দাম সেই মুহূর্তে সামনের জনই হতেন আরেকজনের সঙ্গী। মোমের শিখা তখন নিভে গেছে। চারিদিকে চাপচাপ অন্ধকার। তারই মধ্যে যুগলবন্দী পুরুষ নারীরা সৃষ্টি-রহস্যের বিচিত্র খেলায় নিবিষ্টভাবে মগ্ন। খেলা শেষে মুছে যেত কামনার শেষ চিহ্নটুকু। শরীরে তখন এক আবেশের শান্তি। সেই শান্তিকে পাথেয় করে সুরু হত অন্য চিন্তা। এক অ-দেখা, পরমাশ্রয়, মঙ্গলময়ের চিন্তা।

পিতা এফিম ভাবছিলেন, আর দেরী করা যায় না। ছেলের যা ধরণ ধারণ তাতে আর দরকার নেই দেরী করে। শেষকালে কি সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী হয়ে যাবে নাকি? তার চেয়ে বরঞ্চ একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাক। সংসারের জোয়াল কাঁধে চাপলেই ঠিক হয়ে যাবে। স্বভাব চরিত্রেরও পরিবর্ত্তন ঘটবে হয়ত।

ভারখোতুর্যা থেকে ফিরে আসার পর এফিমকে ছেলের বিয়ের ব্যাপারে বেশী চিন্তা করতে হয়নি। কিংবা বলা যায়, রাসপুটিন, এফিমকে চিন্তামুক্ত করার পথ নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। একটি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী চাষী কন্যাকে বিয়ে করলেন রাসপুটিন। মেয়েটির সবই ভাল ছিল। শুধু বয়েসটা একটু বেশী। রাসপুটিনের চেয়ে চার বছরের বড়।

নবপরিনীতা বধু প্রাসকোভি জানত রাসপুটিনের স্বভাব চরিত্র কেমন। অবশ্য না জানারও কথা নয়। গ্রামের কেইবা না জানত রাসপুটিনের কি স্বভাব, সে কি চায়। কিন্তু তার অনুযোগ ছিলনা কোন। তার প্রাপ্য ভালবাসাটুকু পেলেই সে খুশী থাকত। তারপর আর কিছু যদি রাসপুটিন অন্যত্র বিতরণ করত, তাতে তার আক্ষেপ হত না।

প্রাসকোভির চার ছেলেমেয়ের মধ্যে বড়টি ছিল ছেলে। সে ছোট,

বেলাতেই মারা যায়। দ্বিতীয় ছেলেটি ছিল অপরিণত মস্তিষ্ক। শুধু দুই মেয়ে মেরিয়া ও বারবারা ছিল স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অধিকারিনী।

ছেলে মেয়ে হবার পর রাসপুটিন হঠাৎ যেন তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। এফিমের কাছে গিয়ে বলল,—এভাবে চলবে না। চাষই করতে হবে।

এফিম ভাবলেন, ছেলের বোধহয় মতিগতি পালটাল। বললেন, বেশত, শুরু করনা। ইচ্ছে যখন হয়েছে, কাল থেকেই লেগে যা।

পরদিন রাসপুটিন ক্ষেতে নেমে পড়ল। চাষে তার যেন আগ্রহের শেষ নেই মনে হল। শক্ত জমিতে সবুজ স্বপ্ন ফলাতে সে যেন বদ্ধপরিকর। রাসপুটিন রোজ নিয়ম মত ক্ষেতে যায়। কাজ করে, ঘরে ফেরে।

একদিন ক্ষেতে কাজ করতে করতে রাসপুটিনের মনে হল, কে যেন তাকে ডাকছে, কে যেন হাতছানি দিয়ে বলছে আয়, চলে আয়। দেখে যা গ্রীসের মঠে মঠে কি বিস্ময়! এসব না দেখলে তোর মধ্যেকার সে জেগে উঠতে পারবে না।

রাসপুটিনের সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে গেল। তাইত। ডাক যখন এসেছে তখন যাবই।

এফিম শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, সে কি রে! গ্রীস কি এখানে নাকি। দুহাজার মাইল পথ যাবি কি করে?

রাসপুটিন বলল, আমি জানি। তবু আমি যাবই।

প্রাসকোভি ইতিমধ্যে এফিমের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে এফিম বলল,—কিন্তু প্রাসকোভি, ছেলেমেয়েরা তাদের কোথায় রেখে যাবি? তোর কি কোন দায় দায়িত্ব নেই এদের প্রতি?

রাসপুটিন নিরাসক্ত মুখে বলল,—ওরা এখন তোমার কাছে থাকবে। আমিত চিরকালের জন্য যাচ্ছিনা, আবার তো আসব। এই ক'টা দিন, শুধু এই কটা দিন ওদের দেখ।

এফিম জানতেন প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। তিনি আর কোন প্রতিবাদ করলেন না।

রাসপুটিন গ্রীসে তীর্থ করতে যাচ্ছে এখবর গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে গেল। যাবার দিন অনেকে এসে দাঁড়াল। পিতা এফিম, স্ত্রী প্রাসকোভি তাকিয়ে রইল যতক্ষণ দেখা যায়। রাসপুটিন ধীর স্থির পায়ে হেটে রওনা হল।

গ্রীসের মাউন্ট এ্যাথসের মঠ থেকে রওনা হয়ে রাসপুটিন আবার যখন ফিরে এলেন ততদিনে দুটি বছর পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ফিরে এলেন এ কোন রাসপুটিন! মুখে একগাল দাড়ি। দৃষ্টি সৌম্য শান্ত, থেকে থেকেই উপাসনায় বসে। সে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মেয়ে মানুষে আকর্ষণ কমে গিয়েছে।

খবর এল, গ্রামে একজন অসুস্থ। রাসপুটিনকে কেউ ডাকেনি, তবু খবর পেয়ে সে উঠে দাঁড়াল। অসুস্থ মানুষটির শিয়রে গিয়ে দাঁড়াল। হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করল বিড়বিড় করে।

গ্রামের বৃদ্ধ যাজকের কাছে খবর গেল, এক উটকো উৎপাত সুরু হয়েছে। বুড়ো যাজকদের আর করে খেতে হবেনা। রাসপুটিন বহু দেশ ঘুরে, ফিরে এসেছে। সে নাকি খুব ধম্মোটম্মো করেছে। সবাই তাকে মানছেও বেশ। চেহারাও হয়েছে চমৎকার।

প্রধান যাজক শুনে চমকে উঠলেন,—বটে। ধর্ম ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা মস্করা চলবেনা। এ ব্যাপারে একটা তদন্ত করতে হবে।

তিতি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন রাসপুটিন। বলেছিলেন,—তোমরা থাক তোমাদের তদন্ত নিয়ে। পৃথিবী এক বিরাট জায়গা। আমি অনেক ঘুরে এটা বুঝেছি। এখানে নয়, আমি চলে যাচ্ছি অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে।

উনিশশো তিন সালে একজন মানুষকে দেখা গেল সেণ্ট পিটার্স-বার্গে। দীর্ঘদেহী মানুষটির যাজকের মত চেহারা, দৃষ্টি শানিত। সেখানেও মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল কথাটা, এই সেই, এই সেই বিখ্যাত রাসপুটিন। আকাশের তারাদের মুখের দিকে তাকিয়ে যে অলৌকিক সব কথা বলতে পারে।

রাসপুটিন সম্পর্কে আরও অনেক কথা শোনা গেল আড়ালে আবডালে। সে নাকি ভীষণ কামুক, অত্যাচারী ছিল; সে জন্য তার অনুশোচনা হয়েছিল। অনুশোচনায় স্নিগ্ধ হয়ে সে মঙ্গলময় বিশ্বপিতার আশীর্বাদ এক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

রাসপুটিনের কাছে খবর গেল, সেণ্ট পিটার্সবার্গের বিখ্যাত গীর্জাধ্যক্ষ ক্রনস্টাট আপনাকে ডেকেছেন।

রাসপুটিন গেলেন। ক্রনস্টাট তাকে মর্যাদার সঙ্গে, সমাদরে গ্রহণ করলেন।

সেণ্ট পিটার্সবার্গের ঘরে ঘরে খবর পৌঁছে গেল লোকের মুখে মুখে, ক্রনস্টাট এর মত বিখ্যাত যাজকও তার ক্ষমতাকে বিশ্বাস করেন, তাঁকে আতিথ্য দেন, সাইবেরিয়ার সেই অসাধারণ মানুষটি শহরে এসে পৌঁছেছে।

সেণ্ট পিটার্সবার্গের সুরম্য বাড়ীর সুদৃশ্য ড্রইংরুমে যাবার সময়ও রাসপুটিন তার পোশাক আশাক তেমন কিছু পরিবর্তন করতনা। ঢলঢলে প্যাণ্ট, গায়ে কৃষকের কামিজ, জুতোর সামনেটা ভোঁতা, গায়ের জামায় দুর্গন্ধ। তার জামা কাপড় ছাড়ার কোন বালাই ছিলনা। সে ঘুরত ফিরত খেতো এবং একই পোষাক পরে ঘুমুতে যেতো। ঘুম থেকে উঠে সেই-পোষাকেই আবার ঘোরাফেরা। স্নানের কোন

বালাই ছিলনা। হাতের নোখ ছিল বড় বড়। নোখের নীচে কালো ময়লা। চুল নেমে এসেছিল কাঁধ পর্যন্ত। কাঁধ চওড়া, সুগঠিত শরীর।

রাসপুটিনের পুতিগন্ধময় পোষাক কিংবা তার নোংরা অভ্যাস-গুলোও সবাই ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতেন, কারণ তাদের চোখে রাসপুটিনত সাধারণ মানুষ নন! তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য এক মানবপুত্র, যে বর্তমানকে অতিক্রম করেও ভবিষ্যৎ এর সব কিছু দেখতে পায়। যার প্রার্থনা ঈশ্বর শোনেন, যে মৃতের দেহে প্রাণের সঞ্চার করতে পারে কিংবা জীবন্মৃত করতে পারে উজ্জীবিত।

রাসপুটিনের পোশাক এবং ব্যবহার একদিক থেকে রাসপুটিন সম্পর্কিত কিংবদন্তীগুলো ছড়াতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। সেণ্ট পিটার্সবার্গের প্রাচুর্য্যে ভরা মানুষদের কাছে রাসপুটিন ছিল এক বিশেষ ব্যতিক্রম। তারা অভ্যস্ত ছিল সুগন্ধে সুরভিত ঘরে, সুবিন্যস্ত পোশাক আশাকে, এটাকেই তারা স্বাভাবিক বলে জানত। সেই স্বাভাবিক পরিবেশে রাসপুটিনের অস্বাভাবিক পোষাক আষাক ব্যবহার এই কথাই তাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলছিল যে, রাসপুটিন তাদের আর পাঁচজনের মত নয়। যেহেতু ঈশ্বরের আশীর্বাদ—পুষ্ট সেহেতু সে বিলাসবহুল পোশাকের কোন আকর্ষণ বোধ করেনা। অথবা তার মধ্যে এক ঐশ্বরীক ক্ষমতা আছে বলেই সে এসব জাগতিক জিনিষকে তুচ্ছ করতে পারে। বিলাস বৈভবের মধ্যে এই হেলা ফেলা—সেত শুধু অসাধারণ মানুষই পারে।

রাসপুটিনের চেহারার মধ্যে সবচেয়ে যা বৈশিষ্টপূর্ণ ছিল তা হল হল তার চোখ। সকলেরই চোখ থাকে। সকলেই চোখ দেখে। কিন্তু রাসপুটিনের মত চোখ দেখা যায় না। শানিত, যেন চামড়া কেটে ভেতরের সব কিছু নেড়েচেড়ে দেখে নিচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন, তাকালে মনে হয় বুকের ভিতর একটা গরম স্রোত বয়ে চলেছে। আলেকজান্দ্রিয়ার সহচরী আনা ভিরুবোভা বলেছেন, রাসপুটিনের

মুখ ছিল পাণ্ডুর, লম্বা চুল। আর সাঙ্ঘাতিক এক জোড়া চোখ। আরও, জ্বলজ্বলে, অসামান্য।

কি ছিল সেই চোখে, যা বহুজনে বহুবার উল্লেখ করেছেন। তার চোখ আসলে কি ছিল? তার সম্পদ না তার আয়ুধ?

এক তরুণীর জবানীতে এই দৃষ্টিরই উল্লেখ পাওয়া যায় যখন সে লেখে,—শুনেছিলাম অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন একজন এসেছেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা শুনে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তার মুখ থেকে ধর্মের কিছু কিছু কথা শুনবো। আমার দিকে তিনি তাকালেন। যাজকের স্নিগ্ধ দৃষ্টি। কিন্তু একটু পরেই তিনি এগিয়ে এলেন কাছে, খুব কাছে। দেখতে দেখতে তার চেহারার পরিবর্তন দেখা দিল। কোথায় গেল সেই স্নিগ্ধ যাজকের দৃষ্টি! আমার চোখের সামনে তখন একজন কামার্ত্ত মানুষের মুখ। তার নীলচে চোখ তখন কালো হয়ে গেছে। তার মুখে বেশ কয়েকটা ভাঁজ, তার দৃষ্টি শানিত। মনে হচ্ছিল, দৃষ্টিটা যেন আমার ভিতরটা কেটে কেটে দেখছে। তার মুখ আমার মুখের কাছে এগিয়ে এল। তার গরম নিশ্বাস আমার নাকে লাগল। আমার কানে কানে ফিসফিস করে সে উত্তেজক কথা বলতে শুরু করল। আমার শরীরের ওপর যেন আমার আর কোন নিয়ন্ত্রণ রইলনা। আর ঠিক তখনই আমি মনে মনে বলতে লাগলুম, হে ঈশ্বর, আমি তো ঈশ্বরের কথাই শুনতে এসেছিলুম। সে বোধ হয় বুঝতে পারল আমার অবচেতন মনে আত্মনিয়ন্ত্রের ক্ষমতা ফিরে আসছে, একটু পরেই আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠব। সে আবার নিজেকে পালটে ফেলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখে ফিরে এল যাজকের স্নিগ্ধ দৃষ্টি। সে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। বলল, চিন্তা কোরনা। বিশ্বাসের আধার হচ্ছে মন। মনকে শক্ত রাখ। বিশ্বাসই মনকে শক্ত রাখতে পারে।...... আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম এ আসলে কি! কামুক, যাজক নাকি সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কোন মানুষ?

জারস্কো সেলো বা জারের প্রাসাদে রাসপুটিনের প্রথম আমন্ত্রণ এসেছিল উনিশশো পাঁচ সালের নভেম্বরের পয়লা তারিখে। গ্রাণ্ড ডাচেস মিলিটমার মধ্যস্থতায় আমন্ত্রণ এল। রাসপুটিন সবিনয়ে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

জারস্কো সেলোতে রাসপুটিন এসে পৌঁছেছিল রাত্রির খাবারের প্রায় এক ঘণ্টা আগে। সে এসে জারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এমন ভাবে কথাবার্তা সুরু করল তাদের যেন তাদের আলাপ কত দীর্ঘদিনের। সে সোজা আলেক্সির পাশে গিয়ে গল্প শুরু করল, কত কাহিনী দূর দূর দেশের, দুঃসাহসী সব অভিযানের, অচেনা সব মানুষের। কুঁজো ঘোড়া, পা-বিহীন ঘোড়সওয়ার, সুন্দরী হেলেনের। তার বলার ভঙ্গিতে আলেক্সি কাছে ঘেঁসে এল। অন্তরঙ্গ সে সব কাহিনী শুনতে শুনতে আলেক্সি কখনও খুশিতে ঝলমল করে উঠল, কখনও বা দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ হল, কখনও বা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। প্রতিটি গল্প আলেক্সি গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনল। দেখতে দেখতে গল্প জমে গেল। জার, জারিনা, অন্য মেয়েরা সবাই বসে বসে গল্প শুনতে লাগল। আর কেউ কোন কথা বলছিল না, বক্তা শুধুমাত্র একজন। রাসপুটিন। শ্রোতা অন্য সবাই। গল্পের মধ্যে এক পরিবেশ সবার অজান্তে কখন যেন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। রাশিয়ার জার নিকোলাস, সাইবেরিয়ার সাধুর গল্প শুনতে শুনতে বুঝতেই পারেননি কোথা দিয়ে কেটে গেল এতটা সময়।

উনিশশো সাত সালের শরৎ কালের এক সুন্দর সন্ধ্যায় জার নিকোলাস ছোট বোন ওলগাকে ডেকে বলেছিলেন, একজন রাশিয়ান কৃষকের সঙ্গে দেখা করবে?

ওলগা বিস্মিত হয়েছিলেন। কৃষক? তার সঙ্গে নিকোলাস পরিচয় করিয়ে দিতে চান। কেন?

নিকোলাস আবার বলেছিলেন, দেখ, ভাল লাগবে। একবারও বলেননি, যার সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দেব সে একজন মস্ত সাধুসন্ত। অদ্ভুত সব ক্ষমতা তার আছে।

ওলগা দাদার কথায় আপত্তি করেননি। দু'জনে একসঙ্গে হেঁটে গিয়েছিলেন নার্সারির দিকে।

প্রাসাদের ঘরে ঘরে তখন আলো জ্বলেছে। ওলগা নার্সারিতে গিয়ে দেখলেন চার বোন তাদের ছোট ভাইকে নিয়ে গল্পগুজব করছে। তাদের পাঁচজনেরই পরণে সাদা রাত্রিবাস। নিকোলাস ফিসফিস করে বললেন, কেমন দেখছ?

ধবধবে সাদা রঙের রাত্রিবাসে তাদের চমৎকার দেখাচ্ছিল। ওদের দিকে তাকিয়ে ওলগা বলল, আলেক্সিওতো বেশ হাসছে।

—আর ঘরের মধ্যে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে কেমন দেখছ! ওলগা আগেই দেখেছিল মাঝারি গড়নের একজন মানুষ ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে। তার কাঁধ চওড়া, মুখে মৃদু হাসি, কাঁচের মত ঝকঝক করছে চোখ। লোকটি ওলগা বা নিকোলাসের দিকে ফিরেও তাকাল না। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। ওরা যেন এরই অপেক্ষায় ছিল, সবাই একই সঙ্গে ছুটে গিয়ে ঘিরে ধরল লোকটিকে।

নিকোলাস ফিসফিস করে বলল,—এই হল সেই সন্ত, যার নাম রাসপুটিন।

ওলগা চমকে উঠল, পিটার্সবার্গের সবাই শুনেছে সাইবেরিয়ায় সেই বিখ্যাত মানুষের কথা। ঘরের মধ্যে তবে সে'ই।

আলেক্সি হঠাৎ বলল,—আজ একটা নতুন খেলা খেলব।

রাসপুটিন বলল, কি খেলা?

আলেক্সি বলল, আজ তুমি খরগোস হও। আমি তোমার পিছন পিছন ছুটবো।

রাসপুটিন বসে পড়ল। মেয়েরা হাততালি দিল। আর আলেক্সি ঘরময় ছোটাছুটি করে খেলতে শুরু করল।

আলেক্সির ইচ্ছে থাকলেও শরীরে কুলোয় না। ছোট শরীর অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠে। নিকোলাস শঙ্কিত বোধ করছিলেন।

রাসপুটিন অল্প একটু পরে ঝপ করে আলেক্সির হাত ধরল। তারপরে আস্তে আস্তে হেঁটে আলেক্সির শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে চমৎকার কাজ করা বাতিদানে মোমবাতি জ্বলছিল। কেউ কোন কথা বলছিল না। কোন শব্দ নেই। ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল ওলগা। তার মনে হল, এ যেন কোন শোবার ঘর নয়। এ যেন কারো বাড়ি নয়, এ যেন বহু পুরাতন কোন গীর্জা বা ধর্মস্থান। এখানে ঘরময় নিস্তব্ধতা, অনাবিল শান্তি।

বিছানার পাশে গিয়ে রাসপুটিন দাঁড়াল। ডান হাত দিয়ে আলেক্সির বাঁ হাত ধরে সে মাথা নীচু করল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ রইল। আলেক্সিও নড়লনা চড়লনো। একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ওলগা বুঝতে পারল, রাসপুটিন প্রার্থনার করছে। কোন প্রার্থনা উচ্চারন নেই, কোন প্রার্থনার ভঙ্গি নেই, শুধু মাথাটা বুকের দিকে অল্প একটু ঝুঁকে এসেছে।

জার এবং জারিনার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সময় রাসপুটিন কখনও প্রচলিত নিয়ম মেনে চলেননি। প্রচলিত নিয়ম হল, জারকে 'ইয়োর ম্যাজেস্টি'। 'ইওর ইমপেরিয়াল ম্যাজিস্টি' বলে সম্বোধন করা, তা না করে রাসপুটিন প্রথম দিন থেকেই জারকে বাতুস্কা বা বাবা এবং জারিনাকে মাতুস্কা বা মা বলে সম্বোধন করত। রাশিয়ার ঘরে ঘরে বাবা, মাকে এই বলে সম্বোধন করা হত।

জারের কাছে যেতে হলে সবাই সেজেগুজে যেত। জারের কাছে যেতে পারা ছিল যে কোন লোকের পক্ষেই খুব সম্মানের। জারের সামনে কেউ কখনও গলা তুলে হাসত না, প্রকাশ্যে কেউ সমালোচনা করত না। কিন্তু রাসপুটিন এসবের ধার ধারেননি। জারের সঙ্গে

কথা বলতে বলতে হাসি এলে সে হো হো করে হেসে উঠত। প্রথম প্রথম তার দুর্গন্ধময় পোষাকও পরিবর্তন করত না। জারের কথা পছন্দ না হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করত যুক্তি দেখাত। যখন তখন বাইবেল থেকে উদ্ধৃত দিতে শুরু করত। জার ও জারিনা ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলেন। এ মানুষটি অন্য সবার চেয়ে আলাদা—এ রকম একটা বোধ তাদের মধ্যে ছিল। তাই রাসপুটিন জারপরিবারের বিশেষ প্রশ্রয় প্রথম থেকেই পেয়েছিলেন।

সবার সঙ্গে সব কথা বলা যায় না, রাশিয়ার জার বা জারিনা সবার কাছে যেতেও পারে না। পারিবারিক ঐতিহ্যগত বাধা আছে। জার ও জারিনা রাসপুটিনের সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা বলতে দ্বিধা করতেন না। তাদের বরঞ্চ ভাল লাগত। মনে হত, মানুষটির মনটা বড় ভাল।

নিকোলাস একদিন বলেছিলেন তার একজন রক্ষীকে, আমি রাসপুটিনকে পছন্দ করি কেন জান! লোকটি ধার্মিক। খুব সহজ সরল। আমার যখন কোন দ্বিধা বা সংশয়ের মুহূর্ত আসে আমি ওর কাছে যাই, ওর সঙ্গে কথা বলি। বিশ্বাস কর, ওর সঙ্গে কথা বলে আমি যেন সমাধানের পথ পাই। যেন অন্ধকারে দেখতে পাই আলোর ইশারা। সবচেয়ে বড় কথা, আমার অশান্ত মনে শান্তি ফিরে আসে।

আলেকজান্দ্রা রাসপুটিনকে কোনদিনই সাধারণ মানুষ বলে মনে করেননি। মনে করেছিলেন এ এক আবির্ভাব, এমনিভাবেই যুগে যুগে আবির্ভাব ঘটে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদের। আলেকজান্দ্রা মনে করতেন, ঈশ্বর দয়াপরবশ হয়ে তার কাছে রাসপুটিনকে পাঠিয়েছেন। এবং রাসপুটিনের জন্য আলেক্সি ভয়ঙ্কর অসুখ থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছে। যে দাওয়াই তাকে আরোগ্য দিয়েছে তা হল রাসপুটিনের প্রার্থনা। যার প্রার্থনায় ঈশ্বর সাড়া দেন তিনিওতো মহান একজন সাধক।

আলেকজান্দ্রা গভীর রাত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন

ঘুম না এলে। জানালা দিয়ে একটুকরো চৌকো আকাশ দেখা যেত। আকাশের বুকে তারা। সেই তারাগুলির একটির দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে আলেকজান্দ্রা মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা জানাতেন। প্রার্থনার পর একটি মুখ তার চোখের সামনে যেন ভেসে উঠত। রাসপুটিনের। আলেকজান্দ্রা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, রাসপুটিন তাঁর, তাঁর স্বামীর, পরিবারের এবং রাশিয়ার মঙ্গল করবে, মঙ্গল করার জন্যই ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন।

রাসপুটিন কি মন্ত্রবলে জার ও জারিনার মনে এমন বিশ্বাসের সঞ্চার করতে পেরেছিলেন? সার বারণার্ড বলেছেন, কারণ আর কিছুই নয়, অপত্য স্নেহ। ছেলে তার আশীর্বাদে সুস্থ হয়ে উঠেছে এই বোধই আলেকজান্দ্রাকে বিশ্বাস জুগিয়েছে।

রাশিয়ার তখনকার প্রধান মন্ত্রী ভ্লাদিমির কোকোভস্টোভ বলেছেন, রাসপুটিন আমাকেসম্মোহন করারচেষ্টা করছিল, আমার ঘরে এসে রাসপুটিন একটা চেয়ারে বসে আমার দিকে তাকিয়েছিল। উঃ, কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টি। একটু পরে চা এল। চা খেতে খেতে আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, চোখের পলক পড়ে না। তার চোখের রং পাল্টে যাচ্ছিল। অবশ্য তাতে আমার খুব একটা কিছু যায় আসেনি।

আধুনিক শল্যশাস্ত্র বলে, যদি একজন রোগীর রক্তপাত বন্ধ করা না যায় তবে তাকে সম্মোহিত করে বলতে হবে, তোমারত রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে বহুক্ষেত্রেই দেখা যাবে, রোগীর রক্তপাত বন্ধ হয়েছে।—রাসপুটিনও কি আলেক্সির বেলায় তাই করেছিল? সম্মোহন করেই কি রক্তপাত বন্ধ করেছিল?

জে. বি. এস. হ্যালডেন বলছেন, এটা নাও হতে পারে আবার হতেও পারে। সম্মোহনের জন্য আলেক্সির রক্তপাত বন্ধ হয়ে ছিল—এ সব কথা একেবারে নস্যাৎ করতে পারিনা।

রাসপুটিন শুধুমাত্র সম্মোহনেই এটা করতে পেরেছিল এটাও বিশ্বাস

করা যায় না। কারণ উনিশশো তেরো সালে রাশিয়ার পুলিস বিভাগের ডিরেক্টর স্টিফেন বেলেট্স্কি লিখেছেন, সেন্ট পিটার্সবার্গে একজন শিক্ষকের কাছে রাসপুটিন সম্মোহনের শিক্ষা নিচ্ছেন।—তারওতো অনেক আগে রাসপুটিন আলেক্সিকে ভাল করেছে। তারও তো অনেক আগে রাজ পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, এবং সেই ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ আরও বেড়েছে।

মনে হয়, মূল সত্যটা আরও সূক্ষ্ম কোন কিছুর মধ্যে লুকিয়ে আছে। যেমন, মনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনে রাসপুটিন পেরেছিলেন আলেক্সির রক্তপাত বন্ধ করতে। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে, যদি মনে মানসিক চাঞ্চল্য, ক্ষোভ কিংবা উত্তেজনা থাকে তবে হেমোফিলিয়ায় আক্রান্ত রোগীর রক্তপাত বেড়ে যায়। যদি রোগীর মনে সাহস সঞ্চার করা যায় তাহলে ভাল ফল পাওয়া যায়। যখন আলেক্সির যন্ত্রণা বাড়ত তখন রাসপুটিন ঘর বন্ধ করে তাকে গল্প শোনাত। সেই গল্প শুনতে শুনতে হয়ত আলেক্সির মানসিক উত্তেজনা কমত। তখন রাসপুটিন তাকে বলত, তুমি ভাল হয়ে যাচ্ছ। দেখবে ক'দিনের মধ্যে তুমি একেবারে সুস্থ হয়ে উঠবে।—আলেক্সির বিশ্বাস বাড়ত। রাসপুটিনের মুখে নিশ্চিত আরোগ্যের কথা শুনতে শুনতে আলেক্সি ঘুমিয়ে পড়ত। পরদিন সকালে দেখা যেত সে অনেক ভাল। রাসপুটিন আরোগ্যের কথা গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে আলেক্সির মনেও নিশ্চিত বিশ্বাস সঞ্চার করতে পারত বলেই এমনটা ঘটত।

অন্যদিকে, সুগভীর বিশ্বাসের যুক্তি সবচেয়ে দিয়েছেন ওলগা আলেক্সজান্দ্রোভা। তিনি বলেছেন,—আমি বহুবার দেখেছি রাসপুটিনের অলৌকিক ক্ষমতা। হ্যাঁ, একে অলৌকিক ছাড়া আর কিইবা বলব। আমি প্রাসাদের ডাক্তার ফেডরোভ এর সঙ্গেও কথা বলেছি। ফেডরোভ একজন বিখ্যাত ডাক্তার। কিন্তু তিনিও না বলে পারেননি যে, রাসপুটিনের কিছু ক্ষমতা আছে বটে।

ওলগা আরও বলেছেন,—আমারতো মনে আছে একবারের কথা।. সেবার আলেক্সির অবস্থা সঙ্কটজনক। তার পা ফুলে গিয়েছিল, চোখের নীচে রক্তজমা দাগ, অসহ্য যন্ত্রণা। মাঝে মাঝে সে চিৎকার করে উঠছিল। আমাদের উৎকণ্ঠার শেষ ছিলনা। জারিনার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। ডাক্তার আসছিল, দেখছিল, গম্ভীর ভাবে চলে যাচ্ছিল। কোন ওষুধেই ব্যথা কমছিল না, ফোলা কমছিল না। ডাক্তারদের অবস্থা দেখে আমাদের শঙ্কা আরও বাড়ছিল। ওদের মুখ থমথমে, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কি সব বলছিল। রাত বাড়ছিল। চোখের ওপর সেই যন্ত্রণার দৃশ্য আর দেখা যায় না। জারিনা দেখলাম একজনকে ডেকে বলল, সেণ্ট পিটার্সবার্গের যেখানেই পাও রাসপুটিনকে নিয়ে এস। তাকে বলো, জারিনা তাকে আসতে অনুরোধ করেছে। আলেক্সি গুরুতর অসুস্থ।—পরের ঘটনা আমি জানিনা, কারণ আমি ঘুমোতে চলে গিয়েছিলাম।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙার একটু পরেই জারিনা আমার ঘরে এল। আমি বললাম, আলেক্সি কেমন আছে ?

জারিনা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, বলল, এস, দেখে যাও না।

আমি গেলাম। কিন্তু এ কোন আলেক্সি! গত কালের চেহারার সঙ্গে কোন মিল নেই। কাল ওর সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল। পা ফোলা ছিল। আজ দেখলাম, বিছানায় বসে সে হাসছে। কপালে হাত দিলাম, দেখলাম জ্বর নেই। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আলেকজান্দ্রা, ব্যাপারটা কি! আলেক্সি রাতারাতি কি করে এত ভাল হয়ে গেল ?

জারিনা বলল, সবই তার ইচ্ছা, সে এসেছিল।

আমি বললাম, সে কে ?

আলেকজান্দ্রা আমার চোখে চোখ রেখে বলল, রাসপুটিন এসেছিল। আমিই তাকে খবর পাঠিয়েছিলাম। বিপদে পড়লেই

পাঠাই। তিনি এসেছিলেন। বিশ্বাস কর, উনি আলেক্সিকে স্পর্শ পর্যন্ত করেননি। এসে আলেক্সির দিকে তাকালেন, একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মাথা হঠাৎ বুকের কাছে ঝুঁকে এল। তিনি একমনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন। অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, চিন্তা করনা, ওকে বিরক্ত করনা। আলেক্সি কালই ভাল হয়ে যাবে। আজ সকালে দেখ, অনেকটা সুস্থ, দেখাচ্ছে না?

সাইবেরিয়ার পথে প্রান্তরে যে লোকটি মাল বয়ে বেড়াত কিংবা চাষ করত, সেই মানুষটিই দেখতে দেখতে জার পরিবারের ঘনিষ্ঠ বান্ধবে পরিণত হলেন। রাজার যাকে ভাল লাগে তাকে অন্য অনেক মানুষেরও ভাল লাগে।—নিজেদের স্বার্থে বা রাজভক্তির জন্য—এটা নানা শতাব্দীতে দেখা গেছে। তাই জার ও জারিনার যখন তাকে ভাল লেগে গেল তখন রাসপুটিন দেখলেন, তাকে ভাল লাগে এমন আর বহু লোক রাশিয়ায় আছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেকেই প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

চারপাশের সব কিছু দেখে রাসপুটিন নিজেকে অল্পস্বল্প পালটে নেবার কথা ভাবলেন। দীর্ঘদিনের অভ্যেসের নোংরা পোষাক ছেড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাহুল্য বর্জিত মানুষটির ঘরে এল জামা কাপড় রাখার আলমারী। সাধারণ আলমারী নয়, অসামান্য কাঠের কাজ করা। সেই আলমারীতে থরে থরে সাজানো হল পোষাক। খসখসে পোষাক আর নয়, বিবর্ণ বেশ-বাশ আর নয়। রাসপুটিনের আলমারীতে সিল্কের পোষাকের ছড়াছড়ি। কোনটার রঙ ফিকে নীল, কোনটার রঙ টকটকে লাল, ফিকে হলুদ, গাঢ় বাদামী। চকচকে ঝকমকে সব জামা। কোন কোন জামার গায়ে ফুলের কাজ করা। সেগুলো ছিল বিশেষ জামা। কেননা যে সে নয়, স্বয়ং জারিনা নিজে ঐ সব ডিজাইন করে দিতেন। প্যান্টের চেহারাও পাল্টে গেল। ভেলভেটের কালো ট্রাউজার, চকচকে জুতো পায়ে। আগের সেই রাসপুটিন কোথায় হারিয়ে গেল। ছেঁড়া জামা পুরনো জুতো, দুর্গন্ধময় পোষাক অর্থাৎ যেভাবে তাকে দেখতে অভ্যস্ত ছিল তার

গ্রামবাসীরা কিংবা পরিচিত জনেরা সেগুলো ফেলে দেওয়া হল। জারের প্রাসাদে মানায় এমন পোষাক পরতে রাসপুটিন বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন।

জামাকাপড়ের ভেতর দিয়ে যে জিনিষটা বেরিয়ে থাকত, সামান্য আলোতেও চকচক করত সেটা হল একটি সোনার ক্রস। আগেও সেখানে ক্রস ছিল। সাধারণ, তাতে কোন ঔজ্জ্বল্য ছিলনা। রাসপুটিনের হাত যখন তখন ক্রসকে স্পর্শ করতো। এই সোনার ক্রসটিও দিয়েছিলেন জারিনা আলেকজান্দ্রা।

রাসপুটিনের তখনকার চেহারা অনেক সৌম্য, সুন্দর। সুন্দর পোষাক মানুষের চেহারায় পরিবর্তন আনে। রাসপুটিনেরও এনেছিল। মুখে একগাল দাড়ি, চুল কাঁধের ওপর নেমে এসেছে, গায়ে সিল্কের জামা, কাল ভেলভেটের প্যান্ট, পায়ে চকচকে জুতো। গলায় সোনার ক্রস। মুখে অনর্গল বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি—দেখে চেনার উপায় ছিল না এই মানুষটিকে নিয়েই পিতা এফিমের দিন কেটেছে দুঃশ্চিন্তায়।

রাসপুটিন নতুন পোষাকে আরও বেশী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। তার চেহারার মধ্যে যে বৈপরিত্ত ফুটে উঠতো সেটাই তাকে দর্শনীয় করে তুলতো। গ্রাম্য চাষার মত মুখ, রাজা-রাজরার মত পোষাক—লোকটি জার ও জারিনার স্নেহধন্য।—পিটার্সবার্গের সবাই একথা জানতো। মুখে মুখে অনেক কথা ছড়ায়। রাসপুটিনের সম্পর্কে নানা কথা এমনি করেই ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সব গুজব-রাসপুটিন সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে।

রাসপুটিন সর্বত্র ঘুরে বেড়াতো। ভিড়ের মধ্যেও সবাই তাকে দেখতে পেত। জানতে চাইতো, এ কে? একি সেই! শুধু তাই নয়। নতুন যার সঙ্গেই আলাপ হত। রাসপুটিন তার দিকেই হাত বাড়িয়ে দিত। করমর্দন করতো। যে একবার তার সঙ্গে করমর্দন

করত সে আর রাসপুটিনকে ভুলতে পারত না। চওড়া হাতের আবেগে উষ্ণ করমর্দনের পরই যার চোখের দিকে চোখ রাখতেন রাসপুটিন—সেই মানুষটির সমস্ত শরীরের শিরায় শিরায় যেন রক্ত প্রবাহ বেড়ে যেত।

রাসপুটিনের চোখ খুঁজে নিত সেই মানুষটিকে যার মধ্যে কিছু সংশয় আছে, কিংবা যার দরকার কিছু ব্যক্তিগত পরামর্শ। ভিড়ের মধ্যেও তাকে খুঁজতে অসুবিধা হতনা রাসপুটিনের। পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে রাসপুটিন কোনদিনও কাউকে ফিরিয়ে দেননি। সমস্যা জর্জরিত মানুষটির দিকে তাকিয়ে তিনি বলতেন,—এত চিন্তিত কেন! চিন্তা আসে চিন্তা যায়, যেমন দিন আসে দিন যায়। চিন্তা কখনও চিরস্থায়ী হয় না। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কর না।

জারিনা আলেকজান্দ্রার এক বান্ধবীর নাম লিলি ডেন। তার জবানীতেও একই রকম উক্তি দেখতে পাই। তিনি বলেছেন,—একবার একটা সমস্যায় পড়েছিলুম। অবশ্য তেমন গুরুতর কিছু নয়। তবু সমস্যা তো! আমার স্বামী বেড়াতে যাচ্ছিলেন বাইরে। আমি ভাবছিলাম, ওর সঙ্গে যাবো, নাকি বাড়ীতে আমার ছোট ছেলেটির সঙ্গে থাকব! যাব না থাকব, থাকব না যাব এই টানাপোড়েনে সিদ্ধান্ত আর নিতে পারছিলাম না। সেই সময় একদিন রাসপুটিন আরও অনেকের মধ্যে আমাকে দেখে আমার দিকে এগি[illegible] এলেন। আমার চোখে চোখ রেখে তিনি সামনে দাঁড়ালেন। আমার মনে হচ্ছিল উনি আমার চোখ থেকে মনের সব খবর পড়ে নিচ্ছেন; তারপর খুব আস্তে আস্তে বললেন, পৃথিবীতে এসে দুঃশ্চিন্তায় সময় কাটান একেবারে অর্থহীন। কেন অকারণে মনের টানাপোড়েনে ভুগছ। তোমার কি দরকার জান? গভীরভাবে বিশ্বাস করা যায় এমন কোন অবলম্বন। আর এমন অবলম্বন তো মাত্র একটিই, তিনি হলেন মঙ্গলময় পরমপিতা। আমি জানি তোমার সমস্যাটা কি! ভাবছো তো যে, ঘরে থাকব ছেলের সঙ্গে

নাকি স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাবো ! তোমার মনে হচ্ছে তোমার ছেলে খুব ছোট, বড় অসহায়। তুমি না থাকলে ওর অসুবিধা হবে। তা কিন্তু সত্যি নয়। ছোট ছেলেটির সব বোধ তো এখনও আসেনি, তোমার স্বামী বয়স্ক মানুষ। তুমি যদি না যাও তবে ওর কিন্তু ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগবে।

লিলি ডেন বলেছেন, একটুও না থেমে, স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে রাসপুটিন যে ভাবে সব কথা বললেন, তাতে আমি বিস্মিত হলাম। আমি ফিসফিস করে বললাম, তবে আমি যাব।

রাসপুটিন আমার দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসলেন, তারপর সামনের আর একজনের দিকে এগিয়ে গেল।

পোশাক আশাক চকচকে পড়লে কি হবে রাসপুটিনের মধ্যে, গভীর গোপনে, আসলে সেই সাইবেরিয়ার গ্রাম্য মানুষটিই ছিল। স্থান কাল পাত্র বিচার করার কোন ব্যাপার তার মধ্যে ছিলনা। যখন যা মনে আসত তখন ত'াই বলে দিতেন। তার রসিকতার ব্যাপারটা ছিল আরও মারাত্মক। আদি রসাত্মক যে কোন বিষয় অনর্গল ভাবে আলোচনা করতেন। আশেপাশের মহিলাদের এসব আলোচনার সময় লজ্জায় মুখের রং গোলাপী হয়ে উঠত, পুরুষেরা অসোয়াস্তি বোধ করতেন। কিন্তু রাসপুটিন এসব গ্রাহ্যই করতেন না।

একবার এক সম্ভ্রান্ত পরিবেশে, বিশিষ্ট জনেদের সামনে রাসপুটিন তার বাল্যের কাহিনী বলতে শুরু করলেন। কাহিনীর আরম্ভটি ছিল চমৎকার, শেষটা মারাত্মক। রাসপুটিন বলছিলেন, আমাদের গ্রামের নাম জানেন তো, পোকরভস্কি। সেখানে যেমন শীত, তেমনই লোক-জন কম। কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারলেও সময় কাটে। অথচ সেখানে তো হাতে গোনা যায় এমন কম লোক, মাথার উপরে বিরাট আকাশ, নিচে গুটি কয়েক বাড়ি। সেখানেই একবার সেই

ব্যাপারটা দেখেছিলাম। ব্যাপারটা একটা ঘোড়াকে নিয়ে। দেখলাম ঘোড়াটা পাগলের মত ডাকছে আর ছুটছে। আমিও ওর পিছু নিলুম। সেদিনই দেখলুম, ঘোড়ার সহবাস……রাসপুটিন তারপর একনাগাড়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে শুরু করলেন। রাসপুটিন সেখানেই থামলেন না। তার কাহিনী শেষ হওয়া মাত্র একটি যুবতীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, এতদিন কোথায় ছিলে, আমি তো তোমারই অপেক্ষায় আছি।—যুবতীটি আর চোখ তুলতে পারেনি। রাসপুটিনের মুখের কথা কিন্তু সেইখানে থেমে থাকেনি……

সাইবেরিয়ার গল্প রাসপুটিন সকলকে শোনাতেন। সাইবেরিয়া যে এক অসামান্য জায়গা, সেখানকার আকাশে বাতাসে যে স্বাধীনতার স্বাদ এ কথা রাসপুটিন বারবার বলতেন। রাজপরিবারের সকলে এ সব গল্প শুনতে শুনতে ঠিক করত, এবার একবার সাইবেরিয়ায় যেতে হবে বেড়াতে। অন্য অনেকেও ভাবত, তাইতো, সাইবেরিয়া গেলে তো মন্দ হয় না। রাসপুটিন বহুবার বহুজনকে বলেছেন, তোমরা তো মর্চে ধরিয়ে ফেললে তোমাদের শরীরে। বোধগুলো সব শুকিয়ে এল। জীবন বলতে বুঝলে সমস্যা, টাকা, নিয়তি, কর্মফল। একবার চল সাইবেরিয়াতে। সেখানে এসব কোন ব্যাপার নেই। সেখানে আছে শুধু খোলামেলা বাতাস। মনের জং ধরা তাতে ভাল হয়ে যায়। সেখানে আছে স্বাধীনতার স্বাদ। তোমাদের শহুরে নিয়মের বন্দীদশা সেখানে নেই।

রাসপুটিন তার নতুন জীবনকে মেনে নেওয়ার মুহূর্ত্ত থেকেই সজাগ হয়েছিলেন। তিনি তার দীর্ঘদিনের পোশাক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সঙ্গীরা তাকে কি চোখে দেখছেন, সেদিকেও লক্ষ্য রেখেছিলেন। নতুন পরিবেশে, আর্থিক অসঙ্গতির সঙ্গে পরিচিত মানুষটি প্রাচুর্যে ভরা মানুষদের মধ্যে সহজেই মিশে গেলেন। কিন্তু সজাগ রইলেন, কারণ দরিদ্রদের তিনি জানেন, চেনেন, তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক রক্তের গভীরে। তারা তার সম্পর্কে কি ভাবে সে কথা জানা আছে। জানা

নেই এদের মনে কি আছে। রাসপুটিন খুব তাড়াতাড়ি সেটা জেনে নিতে চাইলেন।

জানতে খুব বেশী দেরী হলনা। রাসপুটিন বুঝতে পারলেন, মেয়েরা তাকে দু'ভাবে পছন্দ করছে। তার ব্যক্তিগত আকর্ষণ ও তার ঐশ্বরিক ক্ষমতার আকর্ষণ সমান ভাবে তাদের টানছে। যৌবনের শুরুতে রাসপুটিন পছন্দ করতেন নারী-সঙ্গ। মধ্য যৌবনে আবার সেই সম্ভাবনার সামনে এসে, সময় ও সুযোগ কোন কিছুই নষ্ট হতে দিলেন না তিনি। মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারের ভাব ভঙ্গি বদলে ফেললেন। তার গলার স্বরে কিসের আমন্ত্রন, তার চোখের দৃষ্টিতে কিসের ইঙ্গিত, তার ভঙ্গিতে কোন ইচ্ছার প্রকাশ তা বুঝতে মহিলাদের অসুবিধে হতনা।

রাসপুটিন নিজেই এগিয়ে আসতেন। তার অভিজ্ঞতাও দীর্ঘ-দিনের। কিশোর বয়সে একাজ করতে গিয়ে বহু মেয়ের কাছে লাথি কামড় তাকে খেতে হয়েছে। কিন্তু মূল ব্যাপারটা জানা। যারা আপত্তি করে তাদেরও ভেতরে কামনার একটা শিখা ধিক ধিক করে জ্বলে। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত রাসপুটিন এক নজর তাকিয়েই বুঝতে পারতেন, কে বেশী এগুবে, কে এগুতে দ্বিধা করবে; কে এগুবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে।

রাসপুটিনের উপভোগ অভিযান শুরু হবার পর একে একে তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা, পদস্থ অফিসার-দের গৃহিণীরা, নায়িকারা। কাউকেই রাসপুটিন ফিরিয়ে দেননি। মরুভূমির জলের খিদের মতো অনির্বান কামনার খিদেয় দগ্ধ মানুষটি সবাইকে সান্নিধ্য দিয়ে তৃপ্ত হতেন। তার সঙ্গে আলাপের সুযোগ যারা সে সময় পেয়েছেন, তাদের মধ্যে বহুজনই রাসপুটিনের শোবার ঘরের চৌকাঠ পার হবার অধিকারও লাভ করেছিলেন।

অবশ্য এজন্য অনুশোচনা কারো ছিল না। অন্তত কেউ প্রকাশ করেননি। তার কাছে আত্মসমর্পণে গভীর এক আনন্দ বা গভীরতর কোন গ্লানি উপসমের আস্বাদ যেন তারা পেতেন। এসব গোপন কথা

বেশীদিন গোপন থাকেনি। প্রকাশ হয়েছিল। তাতে কিছু যায় আসেনি। রাসপুটিন সম্পর্কে এসব কথা নতুন কিছু নয়। অন্যদিকে, রাসপুটিন এসব নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ক্রমশ কিংবদন্তীর মানুষ হয়ে উঠছিলেন।

কোন কিছু বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে তার পেছনে যে একটা উপযুক্ত যুক্তি দেখাতে হয়—রাসপুটিন তা জানতেন। একথাও জানতেন যে, বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে না পারলে দীর্ঘদিন কোন কিছু চলতে পারে না। তাই মহিলাদের কাছে তিনি সম্ভোগের একটা কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন।

রাসপুটিনের মুখের আগল কোনদিন ছিলনা। মহিলাদের তিনি অসংকোচে বলেছিলেন,—তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল! সম্ভোগটা টা উচিৎ হচ্ছে কি না, তাই-তো। বেশ, শোন, ধর তোমার মনে খুব রাগ হয়েছে। তুমি সেই রাগটা মনে জিইয়ে রাখছো। তাতে কি হবে! তোমার রাগতো কমবেই না, শরীরও খারাপ হবে। তা না করে মনের রাগটা যদি প্রকাশ করে ফেল, তাহলে অনেক হাল্কা লাগবে। তেমনি, ধর তোমার মনে একটা গোপন ইচ্ছা রয়েছে। অথচ তুমি তা চেপে রাখলে। বাইরে দেখালে যে তুমি খুব ধর্ম্মটর্ম্মো কর। তাতে কি হবে? তোমার মনের ভেতরের অশুচিতা বাইরের এই শুচিতার মুখোসের মধ্যে তোমাকে মন-প্রাণ এককরে উপাসনা করতে দেবে না। একটা একটা করে কাজ করতে হবে। প্রথমে তোমার অবদমিত ইচ্ছাকে দমন করতে হবে। তার জন্য যা দরকার ত'াই করতে হবে। তারপর উপাসনা। এবার বুঝতে পারছ, কেন সম্ভোগ ব্যাপারটা ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। আসলে ওসব ব্যাপার স্যাপার হয়ে যাবার পরে মনে তো আর কোন গোপন ইচ্ছা থাকেনা, ফলে সেটাই তো প্রকৃষ্ট সময় ঈশ্বর চিন্তা করার। একথা মনে রেখ—যখনই তাকে ডাকোনা কেন, মন-প্রাণ এক করে ডাকতে না পারলে সেই ডাক মঙ্গল-ময়ের কাছে কিছুতেই পৌঁছয় না।

রাসপুটিনের এই মতবাদ অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

বিশ্বাস মনের গভীরে ক্রমশ চেপে বসে। বিশ্বাস শক্তি জোগায়। মহিলারা যখন এই বিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন যে, রাসপুটিন সাধারণ কোন মানুষ নয়, তিনি ঈশ্বর প্রেরীত কিংবা ঐশ্বরীক ক্ষমতা সম্পন্ন তখন তাদের প্রাথমিক দ্বিধা কেটে গিয়েছিল। প্রাণ-মন দিয়ে তারা রাসপুটিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। রাসপুটিন তাদের সঙ্গে রতি অভিসারে রত হলে নিজেদের তারা ভাগ্যবতী মনে করতেন।

আশ্চর্য্যের কথা, রাসপুটিন-সান্নিধ্যের গৌরবের কথা মহিলারা তাদের স্বামীদের কাছে গোপন করতেন না। প্রথমে প্রথম স্বামীরাও স্ত্রীর এই সৌভাগ্যে আনন্দিত বোধকরতেন ; এবং বলতেন সেসব কথা প্রকাশ্যে। নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষ উপভোগ করেছে একথা যে কোন পুরুষ মানুষকে উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু রাসপুটিনের নামটি ছিল ব্যাতিক্রম। তাঁর সম্পর্কিত কিংবদন্তী তাঁকে এমন করে তুলেছিল যে এরকম একটা ঘটনার পরও একজন সমর্থ স্বামী তাঁর স্ত্রীর জন্য গর্বিত বোধ করতেন।

যুক্তি যাদের মধ্যে বেশী, শোনা কথায় বিশ্বাস তাদের মধ্যে কম থাকে। যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে তারা যাচাই করতে চায়। কিছু কিছু অবিশ্বাসীও থাকে। তাদের কারো কারো মনে জেগেছিল তাই তো, কি করে এটা সম্ভব! এরকম একটা ঘটনার পর অবচেতন মনেও কি কোন পাপ বোধ জাগেনা? রাসপুটিনের একজন অনুরাগিনীকে একদা এই প্রশ্ন করেছিলেন একজন মহিলা। অনুরাগিনীটি চমকে উঠেছিলেন, বলেছিলেন,—বল কি হে, রাসপুটিন যদি ডাকে তবে সে তো গৌরবের কথা, আর রাসপুটিন যদি আমাকে আকাজ্ক্ষা করেন তার চেয়ে গৌরবের আমার আর কি থাকতে পারে!

—তুমিতো মনে করছ গৌরব, তোমার স্বামীর কি এজন্য মনে হয়না— এ তার পরাভব! প্রশ্ন করেছিলেন মহিলাটি।

অনুরাগিনী হেসেছিলেন, বলেছিলেন, গৌরব গৌরবই আর পরাভব চিরকালই পরাভব। সত্যিকারের গৌরবের মুহূর্ত্তে কেন যে আমার স্বামীর মনে হবে এ তার পরাভব—তা বুঝতে পারছি না। তাছাড়া, আমি যতজনকে বলেছি, তার চেয়েও অনেক বেশী জনকে বলেছেন আমার স্বামী। এরপরও বলবে, এ তার পরাভব!

প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত রাসপুটিন-অনুরাগিনীরা প্রভু সন্দর্শনে আসতেন। সে তুলনায় পুরুষের সংখ্যা কম। নারীরা ধর্ম কথা শুনতে বা গল্প করার জন্য রাসপুটিনের ঘরে এসে বসতেন। রাসপুটিন সব বন্দোবস্ত ঠিক রেখেছিলেন। উপাচার যেমন দরকার, সবই ছিল। ভাল মদের বন্দোবস্ত ও ছিল। চা, মদ খেতে খেতে তারা রাসপুটিনের কথা শুনত, তার মহাত্মের সঙ্গে পরিচিত হত। ক্রমশ মদের নেশায় চোখের মদির দৃষ্টি সঘন হয়ে আসত। এরকম কোন এক মুহূর্ত্তে রাসপুটিন আহ্বান জানাতেন তার কাঙ্খিত রমণীটিকে। রাসপুটিন যখন রমণীটির সঙ্গে অন্য ঘরে যেতেন তখন অবশ্য তাদের মধ্যে আর ধর্মকথা হত না। অন্য কোন কথার অবকাশও ছিল না। রাসপুটিন তখন কামশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞের মত ভিন্ন এক বিষয় গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে জানাতেন সেই মহিলাটিকে। ঘরের বাইরে তখন হয়ত সকাল কিংবা দুপুর কিংবা সন্ধ্যা। ঘরের মধ্যে তখন চিরকালের একটা ছবির ফ্রেমের মত রাসপুটিন ও তার অনুরাগিনী। ভাললাগা ও ভালবাসার সব অভিব্যক্তি তাদের অবয়বে তখন প্রতিফলিত।

রাসপুটিনের ঘরে একটি টেলিফোন ছিল। যাদের আসবার কথা কিংবা যারা তার কাছে যাবার কথা ভেবেছিলেন—কোন কারণে যেতে না পারলে, তারা ফোনে তাকে জানাতেন। আবেগ সিক্ত কণ্ঠে তারা মার্জনা চাইতেন রাসপুটিনের কাছে। কারো কারো গলা কান্নায় বুজে আসত। একজন অপেরা গায়িকার তখন খুব চাহিদা, তিনিও

ছিলেন রাসপুটিনের একজন অনুরাগিনী, রাসপুটিন সান্নিধ্য ছিল তার কাছে এক সুখ স্বপ্নের মত, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে যতক্ষণ পাওয়া যায় ততক্ষনই পেতে চাইতেন তিনি। যেদিন আসতে পারতেন না, ফোন করতেন। রাসপুটিন ফোন ধরলে অন্য দিক থেকে ভেসে আসত অপেরা গায়িকার সুরেলা গলা—আজ আসতে পারছিনা, অথচ আপনার গলার স্বর না শুনেও স্থির থাকতে পারছিনা। আপনাকে আজ আপনার পছন্দ মত কয়েকটি গান ফোনেই শোনাব।

—বেশত, শুরু হয়ে যাক।—বলতেন রাসপুটিন।

মেয়েটি গান শুরু করত। সুরেলা গলার সেই গান শুনতে শুনতে ফোনের রিসিভার হাতে রাসপুটিন উঠে দাঁড়াতেন। তারপর শুরু হত তার নাচ। কোথাও শেখেননি, তার নাচে দক্ষতার কোন ছাপ ছিল না। রাসপুটিনের কাছে তার কোন প্রয়োজনও ছিল না। গানের সুর ও কথার সঙ্গে তিনি আবেগের অভিব্যক্তি নিয়ে ঘরময় ছোটাছুটি করে বেড়াতেন, কখনও কখনও নাচের ভঙ্গিতে পা মেপে মেপে হাটতেন, মেয়েটি একটার পর একটা গান শুনিয়ে যেত। শুনতে শুনতে রাসপুটিনের চোখের তারায় রঙ পাল্টে কাল হয়ে যেত, গভীর কামনার চিহ্ন ফুটে উঠত তার চোখের ভাঁজে।

রাসপুটিনের চারপাশে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতেন। রাসপুটিন চারদিকে তাকিয়ে দেখতেন, ফুলের মত সুন্দর মুখ চারপাশে। কথা বলতে বলতে রাসপুটিন সব কিছু লক্ষ্য করতেন। পাশে বসে থাকা মেয়েটির হাতে আলতো করে হাত বোলাতে শুরু করতেন। হাত বোলাতে বোলাতে তার ঘাড়ে পিঠে হাত উঠে আসত। আস্তে আস্তে চাপড় দিতেন। রাসপুটিনের স্পর্শে মেয়েটির প্রতিটি রোমকূপে সাড়া জাগত। রাসপুটিন যেন সে কথা টের পেতেন।

রাসপুটিন তার ইচ্ছাকে কখনও দমিয়ে রাখতেন না। কোন ইচ্ছে জাগলে সময়ও নষ্ট করতেন না। তার অনুরাগিনীদের একজন লিখেছেন—রাসপুটিন গল্প করতে করতে হঠাৎ কাউকে কাছে টেনে

নিতেন। তার চুলে আলতো করে হাত বুলোতে বুলোতে তাকে কোলের উপর নিয়ে আসতেন। তিনি থামতেন না, অনর্গল কথা বলতেন। বাইবেল; ধর্ম, দেহ সব কিছুরই কথা বলতেন। তারপর যখন তার ইচ্ছে হত, আমাদের চোখের সামনে দিয়ে সেই মেয়েটিকে নিয়ে তিনি পাশের ঘরে চলে যেতেন। আমরা সেই ভাগ্যবতীটির দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

রাসপুটিন শোবার ঘরে নিয়ে যাবার পর মেয়েটির দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতেন তার মুখে কোন্ অভিব্যক্তি ধরা দিচ্ছে। কারও মধ্যে দ্বিধা ও সংকোচের বিন্দুমাত্র আভাস পেলে রাসপুটিন তার কানে কানে ফিসফিস করে বলতেন, কোন সংকোচন করনা। মনে কোন পাপ বোধ এনো না। আমার সঙ্গে এ ঘরে এসেছ। আমার সঙ্গে দেহের আনন্দে মাতবে। এতে কোন পাপ হওনা। বরঞ্চ এতে পাপ দূর হয়ে যায়। দেহের মালিন্য চলে যায়, পবিত্রতা বাড়ে।

রাসপুটিন শুরু কেমন করে করতে হয় তা জানতেন। কিন্তু কখন সারার সময়, সেটা খেয়াল করতেন না। ফলে মাত্রাজ্ঞানের অভাব প্রকট হয়ে উঠত। সাধারণ নারী থেকে সম্ভ্রান্ত নারীদের মধ্যে নিজের প্রভাব লক্ষ্য করে, তিনি রাজপরিবারের দিকেও হাত বাড়িয়েছিলেন। যার কাছে তিনি সুবিধে করতে পারেননি, তার নাম ওলগা। ওলগার জবানীতেই একদিনের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। ওলগা লিখেছেন, —একদিন নিকোলাস, আমি আর আলেকজান্দ্রা গিয়েছিলাম আনা ভিরুবোভার বাড়ী। আমাদের নেমন্তন্ন ছিল। শুনেছিলাম, রাসপুটিন আসবে, গিয়ে দেখলাম সে এসেছে। আমরা গল্পগুজব করছিলাম। বেশ কাটছিল সময়। খাওয়া দাওয়ার পর আনার সঙ্গে পাশের ঘরে চলে গেল নিকোলাস, আলেকজান্দ্রা। রইলাম শুধু আমি আর রাসপুটিন। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমিও হাসলাম, সৌজন্যের হাসি। রাসপুটিন উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। আমার দিকে এগিয়ে

এল। সোজা আমার কাঁধে হাত তুলে দিল, তারপর আমার কাঁধে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে সুরু করল। আমি তো ওর ব্যাপার স্যাপার শুনেছিলাম। আমি মুখে কিছু বললাম না। তাড়াতাড়ি সরে গেলাম। এমনভাবে গেলাম, যেন আমি অন্য কিছু ভাবিনি, শুধু অন্যদের সঙ্গে বসবার জন্যই উঠে এলাম।......ভাবলাম ব্যাপারটা সেখানেই চুকে গেল। ওমা, ক'দিন যেতে না যেতেই দেখি আনা ভিরুবোভা আমার বাড়ীতে এসে হাজির। আমি বললুম, আসুন, আসুন, কি খবর। সব ভাল তো!—আনা সময় নষ্ট না করে মূল কথায় চলে এল। বলল, তোমাকে রাসপুটিন দেখতে চাইছে, সে এমন ভাবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে যে কি বলব। তুমি একবার দেখা করবে তার সঙ্গে?...বুঝলাম ব্যাপারটা। মুখে কিছু বললাম না। ঘুরিয়ে বললাম, এখনই তো পারবনা, খুব শীগগির ও দেখা হবে না। তবে সময় ও সুযোগ মত নিশ্চয় দেখা হবে।......আনা কি বুঝল কে জানে, সে আমাকে আর পীড়াপীড়ি করেনি।

রাসপুটিন জারের প্রাসাদে যখন তখন ঢুকতে পারতেন। প্রতিটি ঘরে তার ছিল অবারিত দ্বার। কিন্তু এর জন্য একটা গুঞ্জন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল। তা হল, কেন রাসপুটিন এত রাতেও জারের মেয়েদের ঘরে যায়? কেন সে অতক্ষণ সেখানে থাকে? সে সেখানে কি করে?

রাত্রে শোবার আগে জার কন্যারা রাত্রিবাস পড়ত। রাত্রিবাস ছিল সিল্কের সাদা কাপড়ের ঘাগরার মত। শরীরের প্রতিটি ভাঁজ তাতে স্পষ্টভাবে বোঝা যেত। তাদের রাত্রিবাস পরার পর ও রাসপুটিন সেখানে বসে গল্প করতে চাইতেন। কখনও কখনও উঁকি ঝুকি দিতেন। একদিন এ রকম উঁকিঝুঁকি দিতে গিয়ে সে ধরা পড়ে গেল মেয়েদের গভর্নেস তুতচেভার কাছে। তুতচেভা ব্যাপারটা দেখে রাগে ঝলসে উঠেছিল। এত রাতে হচ্ছে কি এটা!

খবরটা পৌঁছে গেল আলেকজান্দ্রার কাছে। তার মেয়েদের সম্পর্কিত ব্যাপার, তাই তার কাছেই আগে পৌঁছল। শুনে আলেকজান্দ্রা গম্ভীর হলেন। ডেকে পাঠালেন তুতচেভাকে। বললেন,—রাসপুটিন আমার মেয়েদের ঘরের দিকে তাকিয়েছে তার মধ্যে দোষের কি দেখলে?

তুতচেভা বিস্মিত হয়ে বললেন,—সে কি! মেয়েরা তখন যে শুধু রাত্রিবাস পরে আছে। তা ছাড়া, অত রাত্রে একজন বাইরের লোক শোবার ঘরে উঁকিঝুঁকি দিলে লোকেই বা কি বলবে।

আলেকজান্দ্রার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল তুতভোর উত্তর শুনে। বললেন,—আমার প্রশ্নের এটা কোন উত্তরই হলনা। আমি অন্য লোকের কথা বলিনি। অন্যলোক আমার মেয়ের ঘরের ত্রি-সীমানাতেও আসতে পারেনা। কিন্তু এ হল রাসপুটিন; ভগবান এঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

ইতিমধ্যে খবর শুনে জার নিকোলাসও জারিন আলেকজান্দ্রার ঘরে এসে পৌঁছলেন। সব শুনে তিনি বললেন,—ঠিক আছে গভর্নেস, তুমি যাও। আমি দেখছি কি করা যায়।

জার নিকোলাস বুঝতে পেরেছিলেন, তুতচেভার বক্তব্যের মধ্যে একটা আন্তরিকতার বোধ আছে। সে না বলতেও পারত। কিন্তু দায়িত্ববোধে বলেছে। সে নিশ্চয় রাসপুটিনের সম্পর্কে সব কথা শুনেছে, তবু সাহস করে বলেছে। নিকোলাস, রাসপুটিনকে ডেকে খুব নম্রভাবে বলেছিলেন,—ব্যাপারটা কিছুই নয়। তবু কেউ কেউ যখন কথা তুলছে তখন রাত বেশী হলে মেয়েদের ঘরের দিকে আর না যাওয়ায় বোধহয় আপনার পক্ষে ভাল। আমরা কিছু মনে করিনা। কিন্তু অন্যেরা মনে করতে পারে। তার তো কোন প্রয়োজন নেই, তাইনা!

আলেকজান্দ্রা এই ব্যবস্থায় একেবারে খুশী হলেন না। অনুগত স্বামী নিকোলাস স্ত্রীর অপ্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ বোধ

করছিলেন। শেষকালে দু'জনে মিলে আলোচনা করে একটা রফায় এলেন। ঠিক হল, বাইরের কেউ কখনও রাসপুটিন সম্পর্কে এমন কোন কথা বলেনি, তুতচেভাই শুধু বলেছে। তুতচেভাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হক। আলেকজান্দ্রা বারেবারেই বলতে লাগলেন,—আলেক্সি শুধু রাসপুটিনের প্রার্থনার জোরেই বেঁচে আছে। ভগবান তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন বলেই না তিনি আমাদের কাছে এসেছেন। এখন আমরা যদি এমন কিছু করি, যাতে দুঃখ পেয়ে উনি এখান থেকে চলে যেতে পারেন, তবে আলেক্সির জীবনও বিপন্ন হতে পারে। উনি চলে গেল কে আলেক্সির জন্য প্রার্থনা করবে!

অসুস্থ ছেলের জন্য নিকোলাসেরও চিন্তার অবধি ছিলনা। কথাটা তার মনে দাগ কাটল। অবশেষে একটি চিঠি পৌঁছেছিল তুতচেভার কাছে। তাতে লেখা ছিল, আপনি খুব দায়িত্বের সঙ্গেই জারের মেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনার দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে আমার মনে কোন দ্বিধা নেই। কিন্তু এখন আর আপনার দেখাশোনার প্রয়োজন নেই। এই কাজের দায়িত্ব থেকে আপনি অব্যাহতি পেলেন।

তুতচেভা বুঝতে পেরেছিলেন, কার জন্য তাকে চাকরী খোয়াতে হল। রাজপ্রাসাদ থেকে বিতারিত হয়ে সে মস্কোর পরিচিত সকলের কাছে রাসপুটিনের কীর্তিকলাপ বলতে শুরু করল। বলল, লোকটা একটা ভণ্ড, শয়তান, লম্পট। কি ধরণের বদমাইশী যে লোকটা শুরু করেছে, ভাবা যায়না। মুখে আনা যায়না এমন সব কাজ করছে।

আলেকজান্দ্রার বোন ডাচেস এলিজাবেথের কাছে তুতচেভার যাতায়াত ছিল। তাকেও বিস্তারিতভাবে সব কথা জানিয়েছিলেন তুতচেভা। বিস্মিত হয়েছিলেন এলিজাবেথ সে সব কথা শুনে। ফলে কিছুদিনের মধ্যে দুই বোনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রাসপুটিনকে কেন্দ্র করে সেণ্ট পিটার্সবার্গে যে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল উনিশশো এগার সালে, সেটা প্রতিবাদের রূপ নিল কিছু দিনের মধ্যে। এতদিন প্রচারিত হয়েছিল, রাসপুটিন এক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ। তাঁকে ছুঁলে দেহমনে বিদ্যুৎ খেলে যায়, গ্লানি দূর হয়ে যায়, শান্তি আসে মনে। এবার অন্য কথা শোনা গেল সম্ভ্রান্ত মানুষদের মুখে। ডাচেস মিলিটসা, গ্র্যাণ্ড ডাচেস আনাস্তাসিয়া বললেন,—ওর অনেক কিছু দেখলাম। ঢের হয়েছে। আর নয়। ওর সঙ্গে আর দেখা করতেও চাইনা।

আনাস্তাসিয়ার স্বামী গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাস আরও কটুভাবে বললেন,—ওই শয়তানটার মুখ দেখতে চাইনা।—শুধু প্রকাশ্যে বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। জারস্কো সেলোতো গিয়ে জারিনা আলেকজান্দ্রার সঙ্গে দেখা করে, তাকেও জানালেন সব কিছু। আলেকজান্দ্রা সব শুনলেন। কোন মন্তব্য করলেন না।

গীর্জায় গীর্জায়ও প্রচারিত হয়েছিল খবরটা। ভগবানের নাম করে সাধু সন্ত সেজে সাইবেরিয়ার মানুষ রাসপুটিন যা ইচ্ছে তাই করছে। সন্তদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়, এমন সব কাজই সে করছে।

অভিযোগ এলে তদন্ত করতে হয়। বিশপ থিয়োফ্যান তখন থিওলজিক্যাল আকাদেমির পরিদর্শক। প্রথম দিকে রাসপুটিনের ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পর্কে তার মনে কোন দ্বিধা দিলনা। তাঁর বিশ্বাস ছিল, রাসপুটিন একজন সৎ সন্ত, যার মধ্যে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে। জারিনা আলেকজান্দ্রার কাছেও তিনি তার মনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তদন্ত করতে গিয়ে তিনি চমকে উঠলেন। তাঁর কাছে মহিলারা আসতেন একের পর একজন। যা বলতেন তারা, তা শুনে বিশপ থিয়োফ্যানের চোখ কপালে উঠল।—বলছে কি সবাই! এতদিন ধরে রাসপুটিন সম্পর্কে যা ধারণা ছিল সবই যে

পাল্টে যাচ্ছে। লোকটা এত ভণ্ড, লম্পট, কামুক! ধর্মে যে গুলোকে অধর্ম বলে উল্লেখ করা আছে, সেগুলোর প্রতিই লোকটার আসক্তি!

বিশপ থিয়োফ্যান একদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন জারিনা আলেকজান্দ্রার কাছে। কথায় কথায় বলেছিলেন, রাসপুটিন সম্পর্কে আঁপনাকে আমি আগে অনেক প্রশংসার কথা বলেছি।

আলেক্‌জান্দ্রা, বিশপ থিয়োফ্যানের চোখে চোখ রেখে তার কথা শুনছিলেন। তার দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফুটে উঠছিল।

বিশপ থিয়োফ্যান আবার বলেছিলেন,—আগে যা বলেছি এখন বোধহয় তা সংশোধন করতে হবে। এখনও যদি না করি তবে খুব বেশী দেরী হয়ে যাবে। দীর্ঘ দিন আমি গীর্জার সঙ্গে যুক্ত। অন্যায় বরদাস্ত আমি কোনদিন করিছি। আজ একটি অন্যায়ের কথা আপনাকে জানাতে এসেছি।

—কি কথা? জারিনা আলেকজান্দ্রা জানতে চেয়েছিলেন।

—রাসপুটিন যা করছে, মানে আমার কাছে এসে অনেক মেয়ে যে সাক্ষ্য দিয়েছে, তারপর বলতে হয়—আমরা ভুল করেছি। সে আর যাই হক সন্ত সম্প্রদায়ের নয়। তার ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করেছে।

আলেকজান্দ্রা কোন উত্তর দেন নি। তবে তার কথা যে আলেকজান্দ্রার ভাল লাগেনি এটা বিশপ থিয়োফ্যান বুঝতে পেরেছিলেন। কেননা, এই সাক্ষাৎকারের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ক্রিমিয়াতে বদলী হওয়ার আদেশ পত্র পেয়েছিলেন।

রাজাদেশ নতমস্তকে গ্রহণ করে ক্রিমিয়ার পথে বিশপ থিয়োফ্যান চলে গেলেও, প্রতিবাদ থেমে থাকেনি। জার নিকোলাসের কাছে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলেন মেট্রপলিটন এন্টনী। এন্টনী স্পষ্ট কথার মানুষ ছিলেন। জারের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি বলেছিলেন,—রাসপুটিনকে নিয়ে চারদিকেই আলোচনা চলছে।

নিকোলাস বলেছিলেন,—রাসপুটিন রাজ পরিবারের বন্ধু।

এণ্টনী বলেছিলেন, বন্ধু—এটা আমরা জানি। আরও কিছু জেনেছি। সেটা খুব দুঃখজনক। তার আচার ব্যবহার একজন ভ্রষ্ট মানুষের মত।

নিকোলাস বলেছিলেন, রাসপুটিন আমাদের পরিবারের বন্ধু। তার ঘনিষ্ঠতা আছে আমাদের পরিবারের সঙ্গে। এ বিষয়ে আপনার কি কিছু বলবার আছে?

এণ্টনী বলতে যাচ্ছিলেন, হ্যাঁ আছে। আর সে কথা বলতেই এসেছি। কিন্তু জার নিকোলাস তাকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন, —না, জারপরিবার সম্পর্কে কোন কথা বলার অধিকার চার্চের নেই।

এণ্টনী বলেছিলেন,—কিন্তু এটাতো শুধু আপনার পরিবারিক ব্যাপার নয় এর সঙ্গে রাশিয়ার ভাগ্য জড়িয়ে আছে। জারোভিচ আলেক্সি তো শুধু আপনারই ছেলে নয়, সে যে রাশিয়ার ভাবী জার।

নিকোলাস আর কথা বাড়াননি। নীরবে ঘাড় নেড়েছিলেন। আলোচনা সভা সেখানেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। এণ্টনী আর বেশীদিন বাঁচেননি। এই সাক্ষাৎকারের অল্পদিন পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান।

রাসপুটিন সম্পর্কে সবচেয়ে জোরাল প্রতিবাদ যিনি তুলেছিলেন তিনি বয়সে রাসপুটিনের চেয়েও ছোট ছিলেন এবং বাগ্মীতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তার নাম ইলিওডোর। রাসপুটিনের সঙ্গে তার প্রথম আলাপ হয়েছিল উনিশশো নয় সালে। সেই সময় তিনি যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে রাসপুটিনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। মনে করেছিলেন, একজন ভাল সঙ্গী পাওয়া গেল। কারণ, দুজনে প্রায় একই বয়সী, দুজনেই বাকপটুতার জন্য বিখ্যাত, দুজনেই সন্ত।

ইলিওডোরের বক্তৃতা শুনতে জনগন ভিড় করত। তাদের কাছে ইলিওডোর আবেদন করেছিলেন, আমি একটি মনেষ্টারি বানাতে চাই। আপনারা সাহায্য করুন।—সাহায্য এসেছিল। ভল্গা নদীর তীরে জারিতজিনে, এখনকার স্টালিনগ্রাডে, সেটা একদিন তৈরীও হয়ে গেল।

ইলিওডোর আমন্ত্রণ জানালেন রাসপুটিনকে,—আসুননা, কিছুদিন জারিতজিনে থেকে যাবেন।

রাসপুটিন আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন। জারিতজিনে এসেও রাসপুটিনের স্বভাবের কোন পরিবর্তন হল না। ইলিওডোর বিস্মিত হয়ে রাসপুটিনের কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন। রাসপুটিনের বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া, বাকপটুতা, শাণিত দৃষ্টি তাকে যত আনন্দ দিত তার চেয়েও বেশী মর্মপীড়া সে পেত যখন সে দেখত তার দর্শনার্থিনীদের কাউকেই রাসপুটিন ফিরিয়ে দেননা। সকলের গণ্ডে এঁকে দেন চুমো। একবার তো সকলের সামনে একটি সুন্দর মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বসলেন রাসপুটিন।

রাসপুটিন ফেরার সময় আমন্ত্রণ জানালেন ইলিওডোরকে, এখানেতো এলাম আপনার আমন্ত্রণে। চলুন এবার আমার গ্রামে, পোকরোভস্কিতে। ভারি ভাল জায়গা।

পোকরভস্কি যাবার পথে ইলিওডোর আরও অনেক কিছু জানতে পারলেন রাসপুটিন সম্পর্কে। বহু আলোচিত সাইবেরিয়ার এই মানুষটিকে কাছ থেকে দেখতে দেখতে তার মনে হয়েছিল, এতদিন এর সম্পর্কে যত কথা শুনেছি তার সঙ্গে এর ব্যবহারে মিল তো বেশী পাচ্ছিনা!

পোকরভস্কিতে যাবার সময় ট্রেনে রাসপুটিন বলেছিলেন ইলিওডোরকে,—বলতো যৌবনে শ্রেষ্ঠ জিনিষ কোনটি?

ইলিওডোর বলেছিলেন,—যৌবন গড়ার সময়। এ সময়ে যত কিছু গড়বার কথা মনে আসে, সেরে ফেলতে হয়।

রাসপুটিন হেসেছিলেন, বলেছিলেন—কথাটা অর্দ্ধেক ঠিক। বাকি অর্দ্ধেকটা বল।

ইলিওডোর বলতে পারেননি, রাসপুটিনই উত্তর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—বাকি অর্দ্ধেকটা হল উপভোগ করা। বেশী বাছ বিচার করনা। উপভোগ করে যাও।

ইলিওডর বিস্মিত হচ্ছিলেন। রাসপুটিন সেখানেই থামলেন না।

সবিস্তারে বললেন কবে প্রথম তার মধ্যে কামের জোয়ার এসেছিল, কিভাবে গ্রামের মেয়েদের সে আকর্ষণ করত, তখন কিভাবে সে জীবনকে উপভোগ করত।—কাউকে বাদ দিই না.। কাউকে না। তোমাদের ঐ যে সব সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা আছে না, ওদের থেকে তোমাদের জারের পরিবার পর্য্যন্ত কাউকে আমি বাদ দিই নি—একবার তো মেয়েদের সামনেই জারিনা আলেকজান্দ্রাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিলাম। আর জার নিকোলাস! সেতো আমার সামনে হাঁটুগেড়ে বসে বলে, আমিই খ্রীষ্ট।—রাসপুটিন গর্ব করে বলেছিলেন।

পোকরোভস্কিতে পৌঁছে রাসপুটিন বলেছিলেন ইলিওডোরকে,—তুমি ভেবোনা তোমাকে আমি কিছু বানিয়ে বলেছি। প্রমাণ দেখাব। জানি, প্রমাণ ছাড়া তুমি বিশ্বাস করতে চাইবে না। কারণ, তুমি তো একজন যুক্তিবাদী তার্কিক।

একগুচ্ছ চিঠি তিনি দেখিয়েছিলেন ইলিওডোরকে।—এই চিঠি-গুলো আমাকে কে দিয়েছে জানো? আলেকজান্দ্রা। না, শুধু জারিনা আলেকজান্দ্রাই নয়, তার ছেলেমেয়েদেরও চিঠি আছে আমার কাছে।

রাসপুটিন চিঠিগুলো এগিয়ে দিয়েছিলেন ইলিওডোরের দিকে। বলেছিলেন, যে কটা ইচ্ছে তুমি নিতে পার। আমি তোমাকে দেব। শুধু একটি চিঠি নিওনা। যেটা জারোভিচ আলেক্সির লেখা। ওর আর কোন লেখা তো আমার কাছে নেই।

ইলিওডোর কয়েকটি চিঠি নিয়েছিলেন সঙ্গে। পড়ে বিস্মিত হয়েছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে তিনি রাসপুটিনকে বলেছিলেন,—এ'কদিন সব দেখলাম, শুনলাম। আপনি যেভাবে চলছেন সেভাবে আর চলবেন না। আপনি অন্যভাবে জীবনযাপন করতে চেষ্টা করুন। আপনার ক্ষমতা আছে, আপনার মধ্যে একজন মহান সন্তের অনেক গুণও আছে। কিন্তু এমন কতগুলো সাঙ্ঘাতিক মানবিক রিপু আপনার মধ্যে রয়ে গেছে, যার থেকে মুক্ত হতে না পারলে আপনার সর্বনাশ নিশ্চিত।

তিতিবিরক্ত হলেও রাসপুটিন সম্পর্কে পরের দু-বছরে ইলিওডোর-কোন কথা বলেন নি। উনিশশো এগার সালে রাসপুটিন সম্পর্কে একটি খবর শুনে ইলিওডোর আর স্থির থাকতে পারলেন না। ক্ষোভে, রাগে তিনি জ্বলে উঠলেন। খবরটা ছিল, রাসপুটিন চার্চের একজন নানকে ধর্ষনের চেষ্টা করেছেন।

সারাটোভের বিশপ হারমোগেনের সঙ্গে দেখা করলেন ইলিওডোর। বললেন—শুনেছেন সব !

হারমোগেন গম্ভীর মুখে জানালেন—হ্যাঁ। সব শুনেছি।

—আর তো চুপ করে থাকা যায় না—ইলিওডোর বললেন।—আমি প্রায় দু-বছর আগে ওরই মুখে ওর লাম্পট্যের কাহিনী শুনেছি। কিন্তু এত নিচে নেমে গেছে ভাবতে পারি নি।

হারমোগেন বললেন—এবার একটা কিছু করতে হবে। নালিশ-টালিশ নয়। ওকে ডেকে পাঠাবো। স্বীকার যদি করে, তবে পেটাবো।

ইলিওডোরেরও মনে ধরল কথাটা। বললেন, তাই করুন।

রাসপুটিনকে জানান হল, আপনার সঙ্গে ইলিওডোর ও হারমোগেন দেখা করতে চান। দেখা হবে বিশপ হারমোগেনের ঘরে।

রাসপুটিন এলেন। বিশপ হারমোগেন তাকে ঘরে বসালেন। ইলিওডোরও সেখানে তখন উপস্থিত। ইলিওডোরের মুখ থমথমে, বিশপ হরেমোগেনেরও। হারমোগেন কথা শুরু করলেন—একজন নান সম্পর্কে একটা কথা শুনলাম। তাকে নাকি ধর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। লোকে বলছে, আপনিই সে চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি ?

রাসপুটিন বললেন—হ্যাঁ, এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে।

হারমোগেন বললেন—এর জন্য আপনি দায়ী এটা স্বীকার করেন ?

রাসপুটিন বিড়বিড় করে বললেন—ঘটনাটা সত্যি। নানটিকে আমার ভাল লেগে গেল। আমি যা চাই তা সে কিছুতেই দিতে রাজি নয়। তাই জোর করলাম। লোকে বলল, ধর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি। মোদ্দাকথা, যা রটেছে তা সত্যি।

হারমোগেন, কথা শেষ হবার আগেই রাসপুটিনের মাথায় প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি কশালেন। তারপর উঠে গিয়ে কাঠের ক্রুশটা টেনে নিয়ে রাসপুটিনকে এলোপাথারি কয়েক ঘা মারলেন।

রাসপুটিন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। এমনটা ঘটতে পারে ভাবা ছিল না। তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানলেন হারমোগেন। পাশেই ছিল ছোট একটা গীর্জা। সেখানে নিয়ে গেলেন। রাসপুটিনের একপাশে দাঁড়ালেন ইলিওডোর, অন্য পাশে হারমোগেন। সামনে যীশুর মূর্ত্তি। হারমোগেন বললেন—ক্রুশ স্পর্শ করে বল, এ রকম কাজ তুমি কখনও করবে না। তুমি যা করেছ তার জন্য তুমি অনুতপ্ত, তুমি আর কখনও কোন মেয়েকে স্পর্শ করবে না, রাজপরিবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না।

রাসপুটিন প্রতিটি শপথই উচ্চারণ করলেন, কোন আপত্তি করলেন না।

পরদিন রাসপুটিন কাতর আবেদন জানালেন ইলিয়ডোরের কাছে, —সত্যিই খুব ভুল করেছি। আমাকে তোমরা মার্জনা কর। তুমি হারমোগেনকে বল, আমার উপর যেন রাগ না করে।

রাসপুটিনের কাকুতি মিনতি শুনে ইলিওডোরের মনে হল, হয়তো এতদিন পরে রাসপুটিন সত্যিই অনুতপ্ত হয়েছে। অনুতপ্ত মানুষকে ক্ষমা করে তাকে আবার সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হবার সুযোগ দেবার শিক্ষা তিনি পেয়েছেন চার্চের কাছে। ইলিওডোর, রাসপুটিনকে নিয়ে গেলেন হারমোগেনের কাছে।

ইলিওডোর বললেন হারমোগেনকে—রাসপুটিন বলছে ও খুব অনুতপ্ত। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

হারমোগেন গর্জে উঠলেন—না। ওর সঙ্গে কোন কথা নয়। আমি ওর মুখও দেখতে চাই না। ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে। আগে ভাল হক, তারপর অন্য কথা। এখন নতুন করে আমার আর কোন কথা নেই।

রাসপুটিন কিছু দিন প্রাসাদের দিকে যান নি। মারের দাগগুলো গা থেকে মুছে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেছেন। মুছে যেতেই প্রাসাদের পথে আবার তাকে দেখা গেল।

আলেকজান্দ্রা খবর পেয়ে ছুটে এলেন। জানতে চাইলেন, হঠাৎ এমন করে কেন উধাও হয়ে ছিলেন রাসপুটিন!

রাসপুটিন পুরো ব্যাপারটা অন্যভাবে বললেন, এমনভাবে বললেন যাতে সমস্ত দোষ চাপে ইলিওডোর ও হারমোগেনের কাঁধে।

জারিনা আলেকজান্দ্রা সমস্ত ব্যাপারটা জানালেন জার নিকোলাসকে। নিকোলাসের তরফে ফতোয়া জারি হল, ইলিওডোর ও হারমোগেনকে দূরে একটি মঠে চলে যেতে হবে।

হারমোগেন আদেশ মেনে নিলেন। বিদ্রোহ করলেন ইলিওডোর। বললেন—অন্যায় করলাম না, অপরাধীকে ধরে পেটালাম, তার জন্য এই শাস্তি! আমি ধরা দেব না   ালিয়ে বেড়াব।—ইলিওডোরকে ধরা গেল না।

ইলিওডোর বুকে বিষের জ্বালা নিয়ে গ্রামে, গঞ্জে, সহরে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন। আজ এখানে, কাল সেখানে। বরাবর তিনি ভাল বক্তৃতা করতেন। এবার শুরু করলেন রাসপুটিন বিরোধী অভিযান। সর্বত্র বলতে শুরু করলেন—কে না মনে করেছিল! আমিওতো আর সকলের মতই মনে করেছিলাম, রাসপুটিন সাধারণ

কোন মানুষ নয়, তার ঐশ্বরীক ক্ষমতা আছে। সে একজন ধার্মিক মানুষ ; তার সংস্পর্শে সকলের মঙ্গল হবে, মঙ্গল হবে রাশিয়ার সকলের। কিন্তু কি দেখলাম! গভীরভাবে মিশতে গিয়ে জানলাম, লোকটা ভ্রষ্ট, লম্পট, কামুক, মাতাল। সে এত নির্লজ্জ যে ওর এই সব কীর্তিকলাপ আবার নিজের মুখে আমাকে শুনিয়েছে। কত সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলা তাদের চরম সর্বনাশের পর আমার কাছে এসে চোখের জল ফেলেছে, কত স্বামী ক্রুদ্ধ ও ক্ষুদ্ধ তা যদি আপনারা জানতেন! কিন্তু কেউ মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারছে না। কি করে বলবে! মুখ খুললেই যে রাজরোষ তার ওপর পড়বে। আপনারা দেখেন নি বিশপ থিয়োফ্যান, মেট্রোপলিটান এণ্টনী কিংবা বিশপ হারমোগেনের কি হয়েছে? কেনই বা আমাকে এরকম পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে? আমাদের অপরাধ, আমরা সত্য কথা বলেছিলাম। আমাদের অপরাধ, আমরা জার ও জারিনাকে রাসপুটিনের কু-কীর্তির কথা বলেছিলাম। আপনারা বলতে পারেন, কেন জার বা জারিনা রাসপুটিনকে এত প্রশ্রয় দেয়? আমার উত্তর হল, অন্ধ ভালবাসা। হ্যাঁ। জারিনা আলেকজান্দ্রা, স্বামী পুত্র কন্যা সহ প্রাসাদে বাস করলেও তার হৃদয়ের গভীরে আছে রাসপুটিনের জন্য ভালবাসা। আমার কাছে প্রমাণ আছে। এই দেখুন একটি চিঠি। জারিনা আলেকজান্দ্রা লিখেছেন রাসপুটিনকে। চিঠিতে লেখা আছে —হে প্রিয়, তোমা বিহনে সময় যে আর কাটতে চায় না। তুমি যখন আমার পাশে থাক শুধু ততক্ষণই আমার মনে শান্তি থাকে। যখন আমি তোমার হাতে চুমু খাই, তোমার কাঁধে মাথা রাখি তখন কি হাল্কা মনে হয় নিজেকে। আমার কামনা শুধু একটি, তা হল, আমি ঘুমাব, তোমার কাঁধে বা শরীরে ঠেস দিয়ে চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি এখন কোথায়?—তোমার জন্য আমার ভালবাসা।

ইলিওডোর বেশীদিন পালিয়ে বেড়াতে পারেন নি। যখন বুঝতে পারলেন আর পালিয়ে থাকা যাবে না, তখন তিনি আত্মসমর্পণ

করলেন। জানতেন, আত্মসমর্পণের অর্থ হল আত্মনিগ্রহের পথ। তবু তার কোন উপায় ছিল না। ধরা-পড়ার চেয়ে ধরা দেওয়াকে তিনি শ্রেয়তর মনে করেছিলেন।

ইলিওডোরকে বন্দী করে রাখা হল। যে মনেষ্টারীতে দীর্ঘ সময় সে কাটিয়াছে সেরকমই একটি মনেষ্টারীতে শুরু হল তার বন্দী জীবন। বলা হল—বিচার হবে, বিচারে যে শাস্তি দেওয়া হবে তাই তোমাকে মেনে নিতে হবে।

ইলিওডোর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেন। মাঝে মাঝে দেখতে পেতেনই দু-একটা পাখী। এসেই চলে যেত। ইলিওডোর ভাবতেন, পাখীদের মত একদিন পালাতে হবে ফুড়ুৎ করে এখান থেকে।

ইলিওডোর অবশেষে পালিয়েছিলেন। এক দিন একজন মহিলাকে দেখা গিয়েছিল রাশিয়া পার হয়ে ফিনল্যাণ্ডের সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে। মহিলাটি ফিনল্যাণ্ডে পোঁছে তার পোশাক পাল্টিয়ে ছদ্মবেশ ফেলে দিয়েছিলেন। ছদ্মবেশী মানুষটিই ইলিওডোর।

জার নিকোলাস শুনেছিলেন পরিস্থিতি খারাপ দিকে যাচ্ছে। রাসপুটিন সম্পর্কিত ঘটনার সঙ্গে জার পরিবার জড়িয়ে পড়ছে। রাসপুটিন বিরোধিতা ক্রমশ বাড়ছে জনগণের মধ্যে। তারা রাসপুটিনের বন্ধু, কিন্তু তার চেয়েও একটি বড় দায়িত্ব তাদের আছে। রাশিয়ায় মর্যাদার সঙ্গে শাসন করা। রটনা বন্ধ করতে না পারলে জারের মর্য্যাদাহানিও ঘটতে পারে।

জারিনা আলেকজান্দ্রার সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করেছিলেন জার নিকোলাস। তারা বিশ্বাস করতেন রটনাগুলো মিথ্যে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তবু তারা সতর্ক হতে চেষ্টা করেছিলেন। রাসপুটিন সেণ্ট পিটার্সবার্গে থাকলেও জারের প্রাসাদে যখন তখন আসা বন্ধ হয়ে

গিয়েছিল। রাসপুটিনের ইচ্ছা ছিল না, তবু আলেকজান্দ্রার অনুরোধে তিনি রাজি হয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলেন, জারাস্কো সেলোতে কম আসবেন। যখন ইচ্ছে হবে আনা ভিরুবোভার বাড়ীতে আসবেন, সেইখানেই সব খবর পাওয়া যাবে। আনা খবর পৌছে দেবে আলেকজান্দ্রার কাছে।

জার নিকোলাসের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে আরও একটি কারণ ছিল। জারাস্কো সেলোতে প্রচুর রক্ষী ছিল। তাদের চোখ এড়িয়ে একটি সুঁচও যেখানে গলতে পারত না। জারাস্কো সেলোতে ঢুকতে হলে নিয়ম মত ঢুকতে হবে। সব কিছুই খাতা কলমে নথিভুক্ত হয়ে যাবে। বলা যায় না, রক্ষীরাও হয়ত কোন দিন গুজব ছড়াতে পারে।

পুলিস রিপোর্টে বলা হয়েছিল, রাসপুটিন সম্পর্কে অনেক অভিযোগ শোনা গেছে। তদন্ত করে দেখা গিয়েছে বেশীরভাগই সত্যি। বহু মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক তার হয়েছে। বহু নারীকে সে প্রকাশ্যে চুমু খেয়েছে।

রিপোর্টে যাই লেখা হোক না কেন, আলেকজান্দ্রা রাসপুটিন সম্পর্কে এসব কথা বিশ্বাস করতে রাজী ছিলেন না। প্রাসাদের ডাক্তার বটকিনের সঙ্গে তার কথাবার্তায় আমরা সেটা দেখতে পাই। তিনি বটকিনকে বলেছিলেন—আমি পুলিসের রিপোর্টের কথা শুনেছি। আমি বিশ্বাস করি না। ওরা অনেক কথা বানিয়ে বলেছে। আমরা রাসপুটিনকে পছন্দ করি এটা অনেকেরই পছন্দ নয়, আমরা জানি সে কথা। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানি, তিনি সাধারণ লোক নন, ভগবান তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর আমার কাছে আসার ঘটনাকে আমি ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করি।

জারিনা আলেকজান্দ্রার ঘনিষ্ঠ সহচরী আনা ভিরুবোভাও

বলেছেন—আমি তো বহুবার রাসপুটিনের কাছে গিয়েছি, রাসপুটিনও কতবার আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু কৈ, আমাদের মধ্যে অবৈধ কোন সম্পর্কতো কোন দিন হয় নি। কতজনের মুখেই যে শুনলাম, রাসপুটিন নাকি হারেম খুলেছে। এতবার গেলাম, একবারও তো দেখলাম না। প্রতি ঘরে ঢুকে দেখেছি, হারেম কোথায়? অথচ বলার সময় লোকে বলে। কেন যে এত রটায়!

Rasputin

রাশিয়ার জার পরিবারের মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে মানুষটির আন্তরিকতা ছিল সবচেয়ে বেশী তার নাম স্টোলিপিন। তিনি তখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ছোট্ট-খাট্ট মানুষটির মুখে একগাল দাড়ি, ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক চোখে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন সকলের। রাশিয়ান পার্লামেন্ট, জারের আমলে যাকে বলা হত ডুমা, সেখানে এই মানুষটি সবচেয়ে প্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। তিনি বলতেন, কেউ কেউ চায় একটা মহান বিপ্লব, আমি চাই এক মহান রাশিয়া।

নিকোলাসও গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন স্টোলিপিনকে। মা'র কাছে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন—অবশেষে আমি এমন একটি লোক পেয়েছি যাকে বিশ্বাসও করা যায়, সম্মানও করা যায়।

পাঁচ বছর নানা ঝোড়ো ঝাপটার মধ্যে স্টোলিপিন তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে তার নতুন কর্মপন্থা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একবার তাকে লক্ষ্য করে বোমা ফাটানো হয়েছিল, তাতে তার অবশ্য কিছু হয় নি, কিন্তু তার ছোট ছেলে ও মেয়ে নাটালিয়া গুরুতরভাবে আহত হয়ে ছিল। পাঁচ বছর শেষ হবার মুখে স্টোলিপিন অন্য এক সঙ্কটের মুখোমুখী হলেন। জার নিকোলাস ক্রমশ তার ওপর বিরূপ হয়ে উঠছিলেন।

আসলে জার নিকোলাসের কান ভারী করা হয়েছিল। ডুমা সম্পর্কে অপপ্রচারের ফলে এটা হয়েছিল। প্রিন্স ভ্লাদিমির ওরলভ জার নিকোলাসকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, ডুমার ব্যাপারটা ভাল হচ্ছে না। পরে এটা জারের ক্ষমতার ওপরও হাত বাড়াবে। কারণ, ডুমাতে স্টোলিপিনের প্রবল প্রতাপ।

বিপ্লবের যে ঝোড়ো হাওয়ার আভাস মাঝে মধ্যে পাওয়া যাচ্ছিল তার সঙ্গেও স্টোলিপিন এর নাম জড়ান হল। বলা হল, স্টোলিপিন আসলে ঐ বিদ্রোহীদেরই সাকরেদ, এখন ভালমানুষ সেজে আছে। ডুমাতে দেখছনা কত নতুন অর্থ নৈতিক আইন-কানুন চালু করছে। এখন থেকে এর ওপর নজর না রাখলে পরে বিপদ হবে। তা ছাড়া ও চেষ্টা করছে ডুমাকে বোঝাতে যে, ঐ যে কথাটা আছে না যে জারের ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত, ঐ কথাটা মুছে ফেলতে হবে।

জার নিকোলাস যখন অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলেন স্টোলিপিনের ওপর তখন আর একদিকে স্টোলিপিন জারিনা আলেকজান্দ্রারও বিরাগ-ভাজন হয়ে উঠেছিলেন। দাবি উঠেছিল, রাসপুটিন সম্পর্কে তদন্ত চাই। লোকটার যা ইচ্ছে তাই করছে। স্টোলোপিন তদন্ত করেছিলেন। তদন্তের রিপোর্ট জারকে দিয়েছিলেন।

নিকোলাস সেটা পড়েছিলেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নেন নি রাসপুটিন সম্পর্কে।

স্টোলিপিন অপেক্ষা করে যখন দেখলেন নিকোলাস কিছু বলছেন না, তখন নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন। তার নির্দেশ গেল রাসপুটিনের কাছে।—অবিলম্বে সেন্ট পিটার্সবার্গ ছেড়ে চলে যান।

খবর পৌঁছে গেল আলেকজান্দ্রার কাছে। তিনি আপত্তি করলেন। বললেন, এরকম অবাস্তব নির্দেশ দেওয়ার কোন মানে হয় না।

জার নিকোলাস নিবৃত্ত করলেন জারিনা আলেকজান্দ্রাকে। বললেন—প্রধান মন্ত্রী আদেশ পাঠিয়েছে তদন্তের পর। সরাসরি সেটা নাকচ করা ঠিক হবে না। বরঞ্চ এক কাজ করা যাক, চিরকালের জন্য রাসপুটিন নিশ্চয় সেন্ট পিটার্সবার্গ ছেড়ে যাবেন না। এখন কিছু দিনের জন্য তীর্থ করে আসুন অন্য কোথাও। ততদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রধান মন্ত্রী হিসেবে স্টোলিপিনের খুব খারাপ লাগত যখন তিনি দেখতেন, জার ভাগ্য বিশ্বাস করেন। যুক্তির চেয়ে ভাগ্যফলে তার আস্থা বেশী।

স্টোলিপিন বুঝতে পারছিলেন, যে-কোন কারণেই হোক জার তাকে আর আগের মত পছন্দ করছেন না। অবচেতন মনের এই ক্ষোভ প্রকাশ হয়ে পড়ল উনিশশো এগার সালের স্টেট কাউন্সিলের সভায়। ডুমাতে যে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল, সে দিন স্টেট কাউন্সিল সেটা নাকচ করে দেয়। ক্ষোভে দুঃখে স্টোলিপিন বলতে থাকেন—আমি জানি, আমার ওপর জারের আস্থা অনেক কমে গেছে। এরকম অবস্থায় আমাকে কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক, আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হোক।

জার নিকোলাস অবশ্য পদত্যাগ পত্র নিতে চান নি, ফেরত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপনাকে যেমন আমি ছাড়তে পারি না তেমনি ডুমার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ হয়েছে এমন কোন রেকর্ডও আমি রাখতে চাই না।

উনিশশো এগার সালে স্টোলিপিন জার নিকোলাসের সঙ্গে কিয়েভ যাচ্ছিলেন তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের একটি মূর্ত্তি উন্মোচন করতে। চারদিকে লোক গিজগিজ করছে তার মধ্য দিয়ে জারের গাড়ী চলে গেল। তার সামনে পিছনে রক্ষীদের গাড়ী। তারও পেছনে স্টোলিপিনের গাড়ী।

সেদিন সেই ভিড়ের মধ্যে রাসপুটিনও ছিলেন। স্টোলিপিনের গাড়ীর দিকে তাকিয়ে রাসপুটিনের চোখের তারার রং পাল্টে কালো

হয়ে গেল। তিনি স্টোলিপিনের দিকে তাকালেন। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—মৃত্যু, ওর মুখে মৃত্যুর ছায়া, ও মরবেই।

সেদিন সারা রাত রাসপুটিন বিড়বিড় করেছেন—আমি দেখলাম স্টোলিপিনের মুখে মৃত্যুর ছাপ। ও মারা যাবে। যাবেই।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, পরের দিন কিয়েভের অপেরা হলে জারের চোখের সামনেই গুলি করা হয়েছিল স্টোলিপিনকে। তিনি মারা গিয়েছিলেন পাঁচ দিন পরে।

জার নিকোলাস নতুন প্রধান মন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কোকোতসভকে। তিনিও স্টোলিপিন আহত হবার সময় কিয়েভে উপস্থিত ছিলেন।

কোকোস্তভ প্রধান মন্ত্রী হয়ে একটা সমস্যার মুখোমুখি হলেন এক বছরের মধ্যে। স্টোলিপিন, রাসপুটিন সম্পর্কে যে তদন্ত করেছিলেন তা মোটামুটিভাবে গোপন ছিল। কিন্তু কোকোস্তভের আমলে সেটা সোচ্চার ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল। ডুমাতে আলোচনা হল, জারের আশেপাশে কালো হাতের দাগ দেখা যাচ্ছে বলে বামপন্থীরা দাবি তুললেন। শীগগিরই রাসপুটিন সম্পর্কিত কথাবার্তা সব রাজনৈতিক আলোচনাকে ছাপিয়ে উঠল।

খবরের কাগজে অনেক খবর প্রকাশিত হচ্ছিল রাসপুটিনকে নিয়ে। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীও প্রকাশিত হচ্ছিল প্রতিদিন। বহু নারীর নারীত্বের অবমাননার কাহিনী। মুখে মুখে ছাড়য়ে পড়ল এমন অনেক কথা যা ছাপা যায় না। শেষে অবস্থা এমন হল যে, নিকোলাসকে একটি আদেশ প্রচার করতে হল। বলা হল, রাসপুটিনের নাম করে কোন কিছু ছাপা চলবে না। দেওয়ালে দেওয়ালে অনেক জায়গায় আঁকা হল রাসপুটিনের ছবি, কদর্যভঙ্গির, অশালীন। শোনা

গেল, ওর সঙ্গে শোয় নি কে! জারিনা আলেকজান্দ্রা, আনা ভিরুবোভা, জারের মেয়েরা কেউ কি বাকি আছে নাকি?

ডুমায় দাবি উঠল, রাসপুটিন সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে। নিকোলাস কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে রাজি হলেন নতুন তদন্ত কমিটি গড়তে। সঙ্গে সঙ্গে জারিনা আলেকজান্দ্রার বিরাগভাজন হয়ে উঠলেন কোকোস্তভ। আলেকজান্দ্রা আশা করেছিলেন, স্টোলিপিনের মত হবেন না নতুন প্রধানমন্ত্রী কোকোস্তভ। রাসপুটিন সম্পর্কে কোন বিতর্ক তার আমলে হলে তিনি নিজেই তা থামিয়ে দেবেন। ডুমার নেতা তা করলেন না দেখে জারিনা আলেকজান্দ্রা মনে করেছিলেন, কোকোস্তভও তাঁর শত্রুদের দলে।

জারিনার অপছন্দ হলে রাশিয়ার কোন মানুষের পক্ষে স্ব-পদে বহাল থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কোকোস্তভও তার প্রধান মন্ত্রীত্ব বেশীদিন বজায় রাখিতে পারেন নি। তিনি বরখাস্ত হয়েছিলেন।

ডুমার পরপর দুই নেতার প্রতি আলেকজান্দ্রার বিরূপতা রাজ পরিবারের সঙ্গে ডুমার সম্পর্ক তিক্ত করে তুলছিল। এর মূলে রাসপুটিন, তার সম্পর্কিত সমালোচনা।

জার পরিবারের কাছে উনিশশো চোদ্দ সালের বসন্ত কাল স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল। শীতের রিক্ততা তখন কেটে যাচ্ছিল, কচি পাতা গজাচ্ছিল গাছে। মৌসুমী ফুল ফুটছিল আর আলেক্সি ক্রমশ ভাল হয়ে উঠছিল। প্রতিদিন সকালে মনে হতো আগের দিনের চেয়ে সে অনেক বেশী সুস্থ।

যে আলেক্সিকে স্পালায় থাকতে মনে হয়েছিল, আর বোধ হয় বাঁচবে না ; ডাক্তারদের যাকে ঘিরে উদ্বেগের অন্ত ছিল না সেই আলেক্সির পা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। সে পা সোজা করতে পারত, ভাঁজ করতে পারত।

জার নিকোলাস ও জারিনা আলেকজান্দ্রা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। এতদিন পরে তবে সত্যিকারের আরোগ্যলাভ করছে আলেক্সি। জার নিকোলাস ঠিক করলেন, ছেলেকে নিয়ে এতদিন কেটেছে গভীর উদ্বেগে। আজ যখন সে উদ্বেগ নেই তখন বেড়াতে বের হব। বেড়ানোর পক্ষে এইতো শ্রেষ্ঠ সময়। বসন্তের বাতাস, প্রসন্ন রোদ, রং বেরংয়ের ফুলে চারদিক ঝলমল করছে।

আলেকজান্দ্রা মনে করতেন, আলেক্সি যে ভাল হয়ে উঠছে তার কারণ একটিই। আর তা হল, রাসপুটিন ওর আরোগ্য চান।

বছরের গোড়ার দিকে জারের প্রসন্ন মন কয়েকমাসের মধ্যে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। একটার পর একটা মানসিক আঘাত তাকে মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল। উনিশশো চোদ্দ সালের ছাব্বিশে জুন তার কাছে খবর পৌঁছেছিল, সারাজেভোতে আর্চডিউক ফার্দিনান্দ মারা গেছেন। পরের দিন শুনতে পেয়েছিলেন, রাসপুটিনকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। সে গুরুতর আহত।

সারাজেভোর ঘটনার জন্য কোন মানসিক প্রস্তুতি নিকোলাসের ছিল না। আর্চডিউক ফার্দিনান্দ স্ত্রী সোফিয়ার পাশে বসে যাচ্ছিলেন। সার্বিয়ার একটি উনিশ বছরের ছেলে, নাম গ্যার্বিয়েল প্রিন্সিপ, গাড়ীর দিকে এগিয়ে এসে খুব সামনে থেকে ছুবার গুলি করেছিলেন। প্রথমে বোঝা যায় নি আর্চডিউকও আহত। সোফিয়া ঢলে পড়েছিলেন স্বামীর বুকে। পরে বোঝা গেল আর্চডিউকেরও গুলি লেগেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ। ঘটনা যে সেখানেই শেষ হবে না নিকোলাস বুঝতে পেরেছিলেন খবর পেয়ে। কিন্তু এই ঘটনা যে এত তাড়াতাড়ি সার্বিয়ার সঙ্গে আস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুদ্ধের রূপ নেবে তা ভাবেন নি

পরের দিন খবর এল, রাসপুটিন বোধহয় বেঁচে নেই। তাকে ছুরি মারা হয়েছে। আলেকজান্দ্রা শুনে চমকে উঠলেন, শঙ্কায় অধীর হলেন। একের পর এক টেলিগ্রাম পাঠালেন পোকরোভস্কিতে—জানান, রাসপুটিন কেমন আছেন।

ঘটনার পেছনে ইলিওডোরের হাত ছিল। ইলিওডোর রাসপুটিনের কণ্ঠ চিরকালের জন্য রোধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কিনা গুসেভা একজন বিশ্বস্ত মহিলাকে ডেকে বলেছিলেন, খুব দায়িত্বপূর্ণ একটা কাজের দায়িত্ব তোমাকে দিতে চাই, পারবে?

—কি? জানতে চেয়েছিলেন গুসেভা।

—খুব গোপনীয়, একজনকে মেরে ফেলতে হবে। রাসপুটিনকে, পারবে। তুমিও তো জান, ওকে মারতে না পারলে রাশিয়ার মঙ্গল হবে না।

—পারব। গভীর প্রত্যয়ে বলেছিলেন গুসেভা। তার মনেও রাসপুটিন বিরূপতা ছিল প্রবল।

—হাত কাঁপবেনা! মৃদু হেসে বলেছিলেন ইলিওডোর।

—এ কাজ করার সুযোগ পেলে আমার হাত দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ করবে। আপনি অপেক্ষা করুন। খবর পাবেন।—কথা বলতে বলতে গুসেভা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।

ইলিওডোর তাকে বলেছিলেন, সবচেয়ে অসতর্ক মুহূর্তে সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত করতে পারলে কাউকে খুন করা খুব সহজ কাজ হয়। পোকরোভস্কি রাসপুটিনের নিজের গ্রাম। সেখানে সে কিছুটা অসতর্ক থাকে। তার ধারণা, গ্রামের কেউ তার কিছু করবে না। এই সুযোগটা নিতে হবে।

রাসপুটিন পোকরোভস্কির রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন উনিশশো চোদ্দ সালের শাতাশে জুন। রাস্তায় দেখা হল কিনা গুসেভার সঙ্গে। যুবতী রমনী। রাসপুটিন রঙ্গ রসের কথা বলতে যাচ্ছিলেন। কিনা গুসেভা রাসপুটিনের গা ঘেঁসে এলেন। রাসপুটিনের খুব সামনে এসে সোজা তার পেটে ইলিওডোরের দেওয়া ভোজালি বসিয়ে দিলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছলকে এল। সে দিকে তাকিয়ে গুসেভা চিৎকার করে উঠলেন, আমি মেরেছি,স্বেচ্ছাচারীটাকে আমি শেষ করে দিয়েছি।

ভোজালিটা পেটের মধ্যে বেশ ভাল রকমই ঢুকেছিল। পেট ফুটো হয়ে নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়েছিল। গুরুতর আহত অবস্থায় তাড়াতাড়ি তাকে তুমেনের হাসপাতালে পাঠানো হল। দু-সপ্তাহ ধরে চলল

যমে মানুষে টানাটানি। সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে ছুটে এল ডাক্তার। অপারেশন হল।

রাসপুটিন অবশ্য সুস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পুরো গ্রীষ্মকালটা তাকে বিছানায় শুয়ে কাটাতে হয়েছিল। রাসপুটিনের হাঁটার ক্ষমতা ছিল না, উপায় ছিল না। পরিশ্রম করলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুইয়ে পরার সম্ভাবনা ছিল।

সার্বিয়ার পট দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। গ্র্যাণ্ড ডিউক ফার্দিনান্দের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল। খবর পাওয়া গেল, চব্বিশে জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে চরমপত্র দিয়েছে। চরম-পত্রের মেয়াদ ছিল আটচল্লিশ ঘণ্টা। তার মধ্যে উত্তর না মিললে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে।

চরম পত্রে পরিষ্কার লেখা ছিল, আর্চ ডিউক ফার্দিনান্দ হঠাৎ আক্রান্ত হন নি। তাকে হত্যা করার জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সতর্কভাবে সে পরিকল্পনার খুঁটিনাটি দেখে নিয়ে তবে আততায়ীরা কাজে নেমেছিল। তা না হলে, এমন নিখুঁতভাবে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারত না। পিস্তল, বোমা এ সবও নির্ঘাৎ সরবারাহ করেছিল সার্ব অফিসারেরা। সার্বিয়াতে ঢুকে আমরা তদন্ত করে দেখতে চাই, কে দোষী। আমাদের কাজে কোন হস্তক্ষেপ চলবে না। আমরা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করব।

চরম পত্রটি লেখা হয়েছিল উনিশে জুলাই। কিন্তু তখনই সেটা প্রচার করা হয় নি। প্রেসিডেন্ট পয়নকারের রাশিয়া সফরের সময় চরমপত্র প্রকাশ করা ঠিক হবেনা মনে করে চারদিন এটি চেপে রাখা হয়েছিল। ভয় ছিল, এই চরমপত্র প্রকাশ পেলে পাছে রাশিয়া ফ্রান্সের আঁতাত গড়ে ওঠে এর পরিপ্রেক্ষিতে। চারদিন পরে প্রেসিডেন্ট যখন ফিনল্যাণ্ডের দিকে রওনা হয়েছেন, তখন প্রকাশিত হল পত্রটি।

রাজনীতিকরা বুঝতে পারছিলেন না ঘটনা কোন্ দিকে বইছে। এই ঘটনার ফল কি হবে তাও সবাই আন্দাজ করতে পারছিলেন। সার্বিয়া বুঝতে পারছিল সামনে যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু একা এঁটে ওঠা

যাবে না। রাশিয়ার কাছে জরুরী বার্ত্তা গেল—আমরা আক্রান্ত হতে চলেছি, আমাদের সাহায্য কর।

নিকোলাস বুঝতে পারছিলেন, সার্বিয়া আক্রান্ত হলে রাশিয়া দর্শক হয়ে থাকতে পারবে না। জারস্কো সেলো থেকে নিকোলাসের ব্যক্তিগত বার্ত্তা পৌঁছেছিল সার্বিয়ার ক্রাউন প্রিন্সের কাছে—চিন্তা করবেন না। যতক্ষণ পারা যায় আমি চেষ্টা চালিয়ে যাবো যাতে যুদ্ধের তুন্দুভি না বাজে। তবু যদি বাজে, যদি অনিবার্য্য হয় রক্তক্ষয় তবে আপনারা একা লড়বেন না। আমরা আপনাদের তুঃসময়ে নীরব থাকতে পারব না। আমরা আপনাদের পাশে আছি। থাকবো।

জারাস্কো সেলোতে কর্মতৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে চব্বিশে ও পঁচিশে জুলাই পরপর তু-দিন মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন জার নিকোলাস জারস্কো সেলোতে। সকলের সঙ্গে একমত হলেন, যুদ্ধ যদি একান্তই অনিবার্য হয়ে ওঠে তবে অনিবার্যভাবেই রাশিয়া গিয়ে পাশে দাঁড়াবে সার্বিয়ার।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চাই। ব্যাপক সমর আয়োজন চাই। বন্ধু হিসেবে তোমাকে মদত দেব বলে কারো পাশে গিয়ে দাঁড়ালেই যুদ্ধে সহায়তা যে করা হয় না—নিকোলাস তা জানতেন। তিনি এও জানতেন, রাশিয়া যদি তখনি যুদ্ধে জড়িয়ে পরে তবে ফল ভাল হবে না। বোসানিয়াতে যে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল সে ঘটনা পুনরাবৃত্তি করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। নিকোলাস চাইছিলেন, সমস্যাটা আলাপ-আলোচনার মধ্যে মিটে যাক।

রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাজনভের কাছে নিকোলাসের বার্ত্তা গেল, যে করেই হোক সময়সীমা বাড়াও। আটচল্লিশ ঘণ্টা বড় কম সময়। যাতে আরও সময় পাও তার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাও। যদি নিতান্তই দেখ যে সময়সীমা বাড়ানো যাবে না তবে অন্য পথ ধর। জার্মানীকে অনুরোধ কর এই ব্যাপারটায় সালিসি করতে। জার্মানী অস্ট্রিয়ার বন্ধু। ওদের কথা অস্ট্রিয়ানরা শুনতে পারে।

সাজ্নভের চেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কিন্তু তার দৌত্য ব্যর্থ হল। অস্ট্রিয়া সাফ কথা জানিয়ে দিল, নির্দিষ্ট সময়সীমার বাইরে এক মিনিটও সময় বাড়ানো হবেনা। জার্মানীও কড়াভাবে জানাল, ব্যাপারটাতো সার্বিয়া আর অস্ট্রিয়ার মধ্যে। এর মধ্যে অন্য কোন শক্তির তো মাথা গলানো উচিত নয়। জার্মানীতো মাথা গলাবেই না। রাশিয়ারও উচিত নয় এর মধ্যে জড়িয়ে পড়া।

সার্বিয়াও যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছিল। অত্যন্ত নরমভাবে তারা চরম পত্রের উত্তর পাঠিয়েছিল। আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন করেও অনেক সর্ত তারা মেনে নিয়েছিল। অস্ট্রিয়া তাতেও চরম পত্র উইথড্র করে নেয় নি। অস্ট্রিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল উনত্রিশে জুলাই ভোর পাঁচটায়।

রাশিয়ার জেনারেল স্টাফের দাবি ছিল, অস্ট্রিয়ার সীমানার চারপাশে সৈন্য মোতায়েন করা হোক। যুদ্ধ যে কোন সময় ছাড়িয়ে পড়তে পারে।—নিকোলাস যে কথা পুরো মানেন নি। কেবল মাত্র আংশিকভাবে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল।

জার্মানীর ওপর তখন অনেক কিছু নির্ভর করছিল। জার্মানী জড়িয়ে না পড়লে যুদ্ধ বেশীদূর ছড়াতে পারবে না বলে মনে করেছিলেন নিকোলাস। তার ধারণা ছিল, জার্মানীও যুদ্ধের অশান্তি চায় না।

নিকোলাসের বিশ্বাস মিথ্যে প্রতিপন্ন হল, জার্মানী অস্ট্রিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল। জার্মানীর কাইজার অস্ট্রিয়ার দূতকে বার্লিনে বললেন, অস্ট্রিয়ার এখন সিদ্ধান্তে আসা উচিত সে কি করবে। আর দেরী করা উচিত নয়। ঘটনার স্রোত যেদিকেই প্রবাহিত হোক না কেন, অস্ট্রিয়া নিশ্চিত থাকতে পারে, যুদ্ধও যদি ঘটে তবে আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়বো। আমাদের মিত্রতা অটুট থাকবে।

জার নিকোলাস জার্মানীর কাইজারের এই ব্যবহারে বিস্মিত ও

ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, জার্মানী আমাদের সঙ্গে এ কি ব্যবহার করল। একে কি সৌজন্য বলে। আমাদের সঙ্গে এমন নির্মম বিশ্বাসঘাতকতা কেউ করে নি। এ ঘটনা আমরা ভুলছি না, ভুলতে পারবো না। আমাদের মনে একটা ক্ষতের মত এই ঘটনা। বিস্ময়কর, কিন্তু সত্যি।

রাজনীতিতে হৃদয়াবেগের কোন স্থান নেই। সঙ্কটের মুখোমুখি এসে কাইজারের মনে হয়েছিল সঙ্কট কেটে যাবে কারণ সার্বিয়া যে ভাবে আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে চিঠি দিয়েছে তারপরে আর যুদ্ধ হবে না বলেই তিনি আশা করেছিলেন। তবু যুদ্ধ যখন অনিবার্যভাবে এসে পড়ল তখন একদিকে তিনি অস্ট্রিয়াকে সমর্থন জানালেন অন্যদিকে জার নিকোলাসের কাছে বার্তা পাঠালেন, যুদ্ধে আমাদের জড়িয়ে না পড়াই হবে উচিত কাজ।

তাদের মধ্যে বার্তা বিনিময় চলছিল। অবশেষে একটি বার্তা এসে পৌঁছল তিরিশে জুলাই। সেই বার্তায় নিকোলাস জানিয়ে দিলেন কাইজারকে—আত্মরক্ষার জন্য অস্ট্রিয়ার সীমানার কাছে সৈন্য সমাবেশ করেছি। আক্রমণ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য আমাদের প্রস্তুত তো থাকতেই হবে। আমি মনে-প্রাণে আশা করছি আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। এখন দরকার আপনার দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করা যাতে অস্ট্রিয়া সমঝোতায় আসে, যুদ্ধ বিরতির পথ নেয়।

কাইজার এই বার্তা পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তার ধারণা ছিল, নিকোলাস সৈন্য সমাবেশ করার কথা ভাববে না। যখন দেখা গেল গোপনে নিকোলাস সৈন্য সমাবেশের কাজ শেষ করে ফেলেছেন তখন কাইজারের মনে হল, এদের বিশ্বাস করা যাবে না। এরা আরও এগোতে পারে।

তিরিশে জুলাই বিকালে জারস্কো সেলোতে যোগাযোগ করে-ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাজনোভ। নিকোলাস তার সঙ্গে আলোচনায়

বসেছিলেন। সাজনোভ বলেছিলেন, যুদ্ধ অনিবার্য। কারণ যুদ্ধ বন্ধের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

নিকোলাস বলেছিলেন, কিন্তু তার মানে কি বুঝতে পারছো? এই যুদ্ধে মারা যাবে রাশিয়ার হাজার হাজার সমর্থ মানুষ। কিন্তু তুমি যা বলছো তাও ঠিক। সব চেষ্টাই তো ব্যর্থ হল। আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করতেই হবে যে কোন মূল্যে। তাই যুদ্ধ যদি অনিবার্যভাবেই আসে তবে আসুক। আমি সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করার আদেশ দিয়েছি।

একত্রিশে জুলাই গভীর রাতে জার্মানীর তরফে পোর্ত্তালেস একটি চিঠি পৌঁছে দিলেন সাজনোভের অফিসে। তাতে লেখা ছিল, বারো ঘণ্টার মধ্যে অস্ট্রিয়ার সীমান্ত বরাবর রাশিয়ায় যে সৈন্য সমাবেশ করেছে তা তুলে দিতে হবে।

বারো ঘণ্টা পর রাশিয়া যখন সেই দাবি জানালেন তখন কাইজার নির্দেশ দিলেন রাশিয়ার সীমান্ত বরাবর জার্মান সৈন্য মোতায়েন কর।

সেদিন রাত্রে খবর পৌঁছে দিল জারের কাছে, জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তলব গেল মন্ত্রীদের কাছে, আমরা আক্রান্ত। জার্মানী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সবাই জারস্কো সেলোতে চলে আসুন। জার আপনাদের সঙ্গে আলোচনা সভায় বসতে চান।

রাসপুটিন, এই যুদ্ধে রাশিয়া জড়িয়ে পড়ুক এটা চান নি। রাসপুটিন সুষ্ঠুভাবে বার বার বলেছেন, এ যুদ্ধে রাশিয়ার ভাল হবেনা। সার্বিয়ার ঘটনা যখন যুদ্ধের রূপ নিচ্ছে তখন ছোরার আঘাতে আহত রাসপুটিন সাইবেরিয়াতে তার বিছানায় শুয়ে শুয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন আনা ভিরুবোভার কাছে। লিখেছিলেন, জারকে বোঝাও যেন এই যুদ্ধে রাশিয়া জড়িয়ে না পড়ে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি শেষের সে দিন

ভয়ংকর। এই যুদ্ধে রাশিয়া শুধু যে হারবে তাই নয়, রাশিয়ার ঘরে ঘরে পুত্রহারা মায়েদের কান্নার আর্তনাদ উঠবে।

শোনা যায় জার নিকোলাস এই টেলিগ্রাম টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছিলেন। কিছু দিন পরে রাসপুটিনের আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আর একটি চিঠি এসে পৌঁছেছিল জার নিকোলাসর কাছে। রাসপুটিন লিখেছিলেন, আমি দেখতে পাচ্ছি রাশিয়ার ভাগ্যাকাশে কালোমেঘের ঘনঘটা। দেখতে পাচ্ছি, আহত নিহত মানুষের রক্তস্রোতে যেন এক রক্ত-সমুদ্রের সৃষ্টি হচ্ছে, ঘরে ঘরে চোখের জল বাধা মানছে না। রাশিয়া এই যুদ্ধে নিয়তি নির্দ্ধারিত ধ্বংসের পথে যাবে। অস্ত্র ধারণ নয়, অস্ত্র সংবরণের কথা ভাবুন।

জার নিকোলাস এই চিঠি পেয়ে আরও ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। যুদ্ধের শুরুতে এমন পরাজয়ের ইঙ্গিত তার কাছে অসহ্য লেগেছিল। বিশেষ করে রাসপুটিনের চিঠির নৈরাশ্যের সুর।

যুদ্ধের সময় আলেকজান্দ্রা নতুন সাজে নিজেকে সাজালেন। ডাক্তার বদ্যিদের নিষেধ শুনে শুনে রুগ্ন মহিলাটি ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। সে সময়ই খবর এসেছিল, রাশিয়া আক্রান্ত। রাশিয়ার ঘরে ঘরে এখন প্রতিরোধের প্রস্তুতি।

আলেকজান্দ্রার মনে পড়েছিল রাসপুটিনের কথা। রাসপুটিন তখন আহত। বিশ্রাম নিচ্ছেন বিছানায়। আলেকজান্দ্রা নিয়মিত তার খবর নিতেন। ভাবতেন রাশিয়ার মানুষের জন্য মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা করবেন এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিশ্চয় এই প্রার্থনা শুনবেন।

আলেকজান্দ্রা জারিনার পোশাক সরিয়ে রেখে বেছে নিলেন সেবিকার পোশাক। সকাল নটায় হাসপাতালে হাজির হতেন। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোগীদের শিওরে শিওরে। কখনও এ হাসপাতাল থেকে সে হাসপাতালে।

জার নিকোলাসও তখন রাজসাজে সজ্জিত। তিনি আন্তরিক-ভাবে চেষ্টা করছিলেন যাতে সৈন্যদের মনোবল বজায় থাকে রাসপুটিনের ভবিষ্যৎবাণী তার মনে ছিল—এ যুদ্ধে রাশিয়ার সর্বনাশ হবে—কিন্তু সেই বাণীর উপর তার কোন আস্থা ছিল না। তবু অবচেতন মনে কথাটা ঘোরাফেরা করতো। নিকোলাস সতর্ক হতেন, কারো যেন মনে না হয় এ যুদ্ধে হার হতে পারে। সবাইকে উদ্দীপিত রাখতে হবে।

আগস্টের পাঁচ তারিখে খবর এল ওয়ারশ'র পতন ঘটেছে, খবর শুনে থরথর করে কেঁপে উঠলেন নিকোলাস মুহূর্তের জন্য। অপমানে

ক্ষোভে তার মুখ পাণ্ডুর দেখাল। ধীর পায়ে হেঁটে ব্যালকনিতে গেলেন তিনি। তখন আলেকজান্দ্রিয়া বসে চা খাচ্ছিলেন। নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে আলেকজান্দ্রার মনে হল, কোথায় যেন কি গণ্ডগোল হয়ে গেছে তারই আভাস নিকোলাসের মুখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। নিকোলাসের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

নিকোলাস স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে তাকালেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, আর একটি খবর এসেছে, আর একটি দুঃসংবাদ। ওয়ারশ'র পতন হয়েছে।

আলেকজান্দ্রা দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে নিজেকে মুহূর্তের মধ্যে সংযত করে নিলেন। তারপর বললেন ধৈর্য ধরতে হবে। যুদ্ধে তো এমন হয়ই।

নিকোলাস বলেছিলেন, জানি, এমন হয়। কিন্তু আর সহ্য হচ্ছে না। একের পর এক অপমানে জর্জরিত হয়ে উঠছি।

জারিনা আলেকজান্দ্রা হয়তো রাসপুটিনকে ডেকে পাঠাতেন এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে। কিন্তু ছোরার আঘাতে রাসপুটিন তখনও অসুস্থ, চলৎশক্তিরহিত। জার নিকোলাস ক্ষুব্ধ হলেও সুস্থ থাকলে রাসপুটিন সম্পর্কে আলেকজান্দ্রার মনে কোন দ্বিধা থাকতো না। কারণ তার চিরকালের বিশ্বাস রাসপুটিন ঈশ্বর প্রেরীত একজন মানুষ। তার দ্বারা কোন অকল্যাণ কারো হয় না। তিনি পাশে থাকলে মঙ্গলময়ও পাশে থাকবেন। আর যে পক্ষে মঙ্গলময় সে পক্ষের জয় অনিবার্য।

আনা ভিরুবোভা বুঝতে পেরেছিলেন আলেকজান্দ্রার মনের কথা। নিভৃতে বলেছিলেন আলেকজান্দ্রাকে, নানা কারণে জারের মন বিক্ষিপ্ত যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আমরাও বিচলিত। রাসপুটিনও আজ আমাদের

পাশে নেই। চল না কোন চার্চের নিভৃত নিরালায় আমরা একদিন গিয়ে প্রার্থনা করে আসি।

আনা ভিরুবোভার কথা মনে ধরেছিল আলেকজান্দ্রার। আগস্ট-মাসের শেষদিকে আওয়ার লেডি অফ কাজান নামের চার্চের দিকে যাত্রা করলেন। আগে থেকে কোন ঘোষণা করা হয় নি, কাউকে জানানো হয় নি, বিরক্ত করবার কেউ নেই—জার, আলেকজান্দ্রা ও আনা চার্চে কুমারী মূর্ত্তির সামনে হাঁটু গেড়ে উপাসনা করতে বসলেন। কোথা দিয়ে কয়েকটা ঘণ্টা পার হয়ে গেল কেউ বুঝতেও পারেন নি। সবাই একসঙ্গে প্রার্থনা করে যখন উঠলেন, তখন কেটে গেছে কয়েক ঘণ্টা।

আলেকজান্দ্রা যখনই সময় পেতেন তখনই বোঝাতেন জার নিকোলাসকে, তুমি ভেঙ্গে পড় না। মনে রেখ, তোমাকে ক্ষমতাবান জার হয়ে বাঁচতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের মর্যাদার কথা। ডুমার সভা ডাকার জন্য অনেকে তোমাকে বলছে। ওদের কথা শোনার দরকার নেই। এখন অনেক বেশী দরকার রাশিয়ার সম্মান পুনরুদ্ধার করার। ডুমার সঙ্গে আলোচনায় বসে সময় নষ্ট করার চেয়েও তা অনেক বেশী জরুরী।

রাসপুটিনের উপর জার নিকোলাস ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যুদ্ধের প্রাক মুহূর্ত্তে, কিন্তু রাসপুটিনকে চিরকালের উপেক্ষা করার উপায় তার ছিল না। আলেকজান্দ্রা বেঁচে থাকতে সেটা সম্ভবও ছিল না।

আলেকজান্দ্রা বুঝতে পেরেছিলেন, আর একটি মাত্র লোক যদি তাকে মদত দেয়, আশ্বাস জোগায় পাশে থাকে তবে অসম্ভবের মধ্যেও সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখা দিতে পারে। যদি রাসপুটিন আবার পাশে এসে দাঁড়ায়।

আলেকজান্দ্রার মনে হত, একমাত্র তিনিই পারেন, যিনি তার

ছেলের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন, তিনি কি জারিনার মান রক্ষা না করে থাকতে পারবেন ?

আলেকজান্দ্রার তখন একটিই কামনা ছিল, তিনি ফিরে আসুন। দায়িত্ব নিন, দরকার হলে প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়ার রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করুন।

রাজপরিবারের সঙ্গে আলাপ হবার পর যুদ্ধের প্রথম কয়েকটা মাস রাসপুটিনের প্রভাব জারস্কো সেলোতে বিশেষ ছাপ ফেলে নি। ফেলার অবকাশও ছিল না। তখন জার বিরক্ত, জারিনা ব্যস্ত, রাসপুটিন আহত।

সুস্থ হয়ে রাসপুটিন ফিরে এলেন পেট্রোগ্রাডে। একদিন ফোন করলেন আনা ভিরুবোভাকে, তুমিতো বরাবরই আমার খবর পৌঁছে দাও জারিনার কাছে। এবার খবর দাও আমি এসেছি, আমি দেখা করতে চাই।

আনা বলেছিলেন, কিন্তু এখনই তো দেখা হবে না। কদিন অপেক্ষা করতে হবে। জারিনা এখন ভীষণ ব্যস্ত।

রাসপুটিন রাগে ফেটে পড়েছিলেন। থাম, তোমাকে কে এত কথা বলতে বলেছে। যা বলছি তাই আগে শোন। খবরটা শুধু পৌঁছে দাও, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আনা আবার বলেছিলেন, বললাম তো, কটা দিন দেরী হবে।

রাসপুটিন কথা বাড়ান নি। ফোন রেখে দিয়েছিলেন। আনা বুঝতে পেরেছিলেন, রাসপুটিন অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

আবার একটা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে রাসপুটিন আবার স্বমহিমায় জার প্রাসাদে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় অকস্মাৎ আবার ভাগ্যোদয় হয়েছিল রাসপুটিনের।

উনিশশো পনের সালের জানুয়ারীর পনেরো তারিখে একটি ট্রেন

ছুটে চলেছিল জারস্কো সেলো থেকে পেট্রোগ্রাডের পথে। জানালার পাশে বসেছিলেন আনা। পার হয়ে যাচ্ছিল পথ প্রান্তর, গাছ, বাড়ী, গ্রাম, সহর। হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটল। আনা কিছু বুঝতে পারেন নি। সজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি বিধ্বস্ত বগীর মধ্যে আটক হয়ে রইলেন।

অনেক কষ্টে আনাকে বিধ্বস্ত কামরা থেকে উদ্ধার করা হল। তার অবস্থা তখন সঙ্কটাপন্ন। তার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল, মাথায় প্রচণ্ড চোট লেগেছিল। মেরুদণ্ডের ওপর প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। জামা কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, আনা আর বেঁচে নেই। কিংবা দেহে তখনও প্রাণ থাকলেও আর বেশীক্ষণ থাকবে না।

খবর গেল জারস্কো সেলোতে। ছুটে এলেন জারিনা আলেকজান্দ্রা ও জার নিকোলাস। আনার অবস্থা দেখে তারা শিউরে উঠলেন। তারা শুনলেন, একজন সার্জেন বলেছেন আনাকে কেউ বিরক্ত করবেন না। মৃত্যুর সময় শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে দিন ওকে।—আলেকজান্দ্রা, নিকোলাস গিয়ে দাঁড়ালেন আনার বিছানার পাশে। অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটির জন্য যখন আনার বুকের ধুকপুকিটুকু চিরকালের জন্য থেমে যাবে। জারিনা চেষ্টা করছিলেন নিজেকে সংযত রাখতে। তবু ক্ষণে ক্ষণে তার চোখের কোল জলে ভরে উঠছিল প্রিয় সঙ্গিনীর আসন্ন বিয়োগ সম্ভাবনায়।

রাসপুটিন জানতেন না আনার এত গুরুতর দুর্ঘটনা হয়েছে। কাউন্টেস উইটি তাকে খবর দিতে রাসপুটিন সঙ্গে সঙ্গে বললেন, একটা গাড়ী, এখুনি একটা গাড়ী দরকার।

কাউন্টেস উইটি তাকে গাড়ী দিলেন। গাড়ী পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলেন রাসপুটিন হাসপাতালের দিকে।

রাসপুটিন যখন পৌছলেন তখন আনার শিওরে জার নিকোলাস ও জারিনা আলেকজান্দ্রা। ঘরে ঢুকে সোজা আনার দিকে এগিয়ে

গেলেন রাসপুটিন। আনা বিড়বিড় করে কি যেন বলছিলেন। আলেকজান্দ্রা মুখের কাছে কান নিয়ে শুনলেন, আনা ভুল বকছে। বিড় বিড় করছে, আমার জন্য প্রার্থনা করুন, রাসপুটিন, আমার জন্য প্রার্থনা করুন।

রাসপুটিনও কান পেতে সব শুনলেন। একদৃষ্টে আনার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর ফিসফিস করে ডাকলেন, আনা।—আনার হাত ধরে আরও দুবার ডাকলেন রাসপুটিন, আনা, আনা।

দ্বিতীয় বার যখন রাসপুটিন ডাকলেন, আনা চোখ মেলে তাকালেন, ক্লান্ত বিষণ্ন দৃষ্টি। রাসপুটিনকে দেখে চোখের তারা যেন ঝিকমিক করে উঠল।

রাসপুটিন বললেন, এবার উঠে দাঁড়াও তো। আনা আবার চোখ মেলে তাকালেন। এবার অনেক স্বচ্ছ দৃষ্টি। রাসপুটিনের দিকে তাকিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলেন।

রাসপুটিন দেখলেন, আনা উঠবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছেন না। আবার বললেন, ঠিক আছে, তোমায় উঠতে হবে না। তুমি বরঞ্চ আমার সঙ্গে কথা বল।

আনা ফিসফিস করে বললেন, আমি জানতাম আপনি আসবেন।

রাসপুটিন ঘুরে জার ও জারিনার দিকে তাকালেন। তারপর আলেক্সির অসুখের সময় যেমন বলেছিলেন তেমনই গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, আপনারা চিন্তা করবেন না। দেখবেন, আনা ভালো হয়ে যাবে।

সার্জেন সবিস্ময়ে বললেন, বলো কি ?

রাসপুটিন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ। বললাম তো ও ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু খোঁড়া হয়ে বাঁচতে হবে ওকে। আনা মারা যাবে না।

রাসপুটিন আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন।

সবাই দেখতে পেলেন, রাসপুটিনের গা দিয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘনঘন, মনে হচ্ছিল রাসপুটিন ভীষণ শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন।

আনা তারপর আরও দীর্ঘদিন ভুগেছিলেন। মৃত্যুপথযাত্রী মহিলাটি ধীরে ধীরে আরোগ্যের আস্বাদ পাচ্ছিলেন। বিস্ময়ের কথা, সেরে উঠলেও আনা আর পায়ের জোর আর ফিরে পেলেন না। রাসপুটিন যেমন বলেছিলেন, কোনরকম খোঁড়া হয়েই তিনি বেঁচে রইলেন। ডাক্তাররা বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, এমন অসম্ভব কাণ্ডও হয়?

আনার প্রথম থেকে রাসপুটিনের ওপর গভীর বিশ্বাস ছিল। এই দুর্ঘটনার পর আনার সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। তিনি মনে করলেন, তার বেঁচে ওঠার কোন সম্ভাবনা ছিল না, বেঁচে ওঠার কথাও ছিল না, রাসপুটিন না এলে বাঁচতেন না। জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে যে মানুষটি সে মানুষটির জন্য প্রাণ-মন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিলেন আনা।

জারিনা আলেকজান্দ্রা আরো একবার রাসপুটিনের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে নিকোলাসকে বলেছিলেন, রাসপুটিনকে ভুল বুঝো না। রাসপুটিন আমাদের অমঙ্গল চায়। সে সাধারণ মানুষ নয়। তাকে সাধারণ মানুষের মত বিচার করো না।

জার নিকোলাস বলেছিলেন, কিন্তু অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে আমি কি ইচ্ছে করে জড়িয়ে পড়েছি। ও তা মনে করে কেন?

আলেকজান্দ্রা উত্তর দিয়েছিলেন, ছোটখাট ব্যাপার ছেড়ে দাও। দিব্যদৃষ্টিতে উনি দেখতে পেয়েছিলেন যুদ্ধে জড়ালে রাশিয়ার বিপদ হতে পারে। উনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। ওর কথার গুরুত্ব না দেওয়া ভুল হবে। আমরা তো ওকে চাই নি। আমাদের সমস্যার দিনে ঈশ্বরই আমাদের কাছে ওকে পাঠিয়ে দেন। আলেক্সির সময় দিয়েছিলেন, আনার সময়ও আবার এনে দিলেন। তাই না!

যুদ্ধের সমস্যাসঙ্কুল প্রথম দুটি বছর রাসপুটিন পেট্রোগ্রাডের বাড়ীতে কাটিয়ে ছিলেন। ছোরার আঘাত থেকে আরোগ্যের পর রাসপুটিন গোরোখোভায়া স্ট্রেটের এই বাড়ীতে এসে উঠেছিলেন।

বাড়াটা পাঁচতলা। চারতলায় থাকতেন রাসপুটিন। তার প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ ছিল না। কারখানার শ্রমিক, করণীক, জাহাজী প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাস করতে কোন অসুবিধা তিনি বোধ করতেন না।

রাসপুটেনের শোবার ঘরটি ছিল ছোট। ঘরের এককোণায় একটি বিছানা, সাধারণ ধরনের। দেওয়ালে ছিল জার ও জারিনার দুটি ছবি ও যীশু খ্রীষ্টের একটি মূর্ত্তি।

মদ্যপানে আসক্তি রাসপুটিনের বাল্যকাল থেকে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত পানাহার চললে পরদিন সকালে উঠতে পারতেন না। যেদিন সকালে উঠতে পারতেন, সেদিন সকালে দর্শনার্থীদের ভিড়ের সামনে হাজির হতেন তিনি। সবাই জানত, রাসপুটিনের অসীম প্রভাব আছে জারিনা ও জার পরিবারের উপর। রাসপুটিন যদি তাদের হয়ে বলেন তবে সেই অনুরোধ রক্ষা করা হবে। প্রার্থীদের মধ্যে দেখা যেত ব্যবসায়ী, অভিনেত্রী, ব্যাঙ্কার, বিশপ, সবাইকে। সবায়ের একই উদ্দেশ্য, রাসপুটিনকে দিয়ে কাজ হাসিল করা।

দর্শনার্থীদের সঙ্গে রাসপুটিন কেমন ব্যবহার করতেন তা জানা যায় কোর্ট সেক্রেটারিয়েটের অধ্যক্ষ মোসলোভের বিবরণী থেকে। তিনি লিখেছেন, রাসপুটিনের কাছে কত লোক কত মহিলা যে প্রতিদিন যেতেন তার ইয়ত্তা নেই। সবাই ধান্দাতে যেতেন।

রাসপুটিন তাদের সঙ্গে দেখা করে যাকে পছন্দ করতেন তার কাছে গিয়ে তার সমস্যার কথা শুনতেন। তারপর কাগজ টেনে নিতেন, কাগজের ওপরের দিকে ক্রশ আঁকা। মধ্যিখানে রাসপুটিনের আঁকা-বাঁকা লেখা। বানান ভুলও অজস্র। বেশীরভাগ চিঠি চলে যেত জারিনা আলেকজান্দ্রার কাছে। ছোট্ট চিঠি—আমার মুখ চেয়ে এর কাজটুকু করে দিন।—জারিনা কখনও রাসপুটিনের অনুরোধ ফিরিয়ে দিতেন না। জারিনার কাছ থেকে সেই চিঠিগুলো যেত জারের কাছে। একনজর দেখে আমি বুঝতে পারতাম কার চিঠি। ওপরের ক্রশ আর অমার্জিত লেখা আমার চেনা হয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন এরকম কয়েকটি চিঠি পেতে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলাম।

কাজের বিনিময়ে রাসপুটিনকে যে যা দিত রাসপুটিন তাই নিতেন। দরাদরির কোন ব্যাপার ছিল না। কেউ টাকার মালা দিলে যেমনভাবে না গুণে তিনি ড্রয়ারে রেখে দিতেন, তেমনি ভাবেই রাখতেন সোনার বোতাম, মূর্তি বা বহুমূল্য অন্য কোন উপহার।

ছোরার আঘাত রাসপুটিনের আদিম ক্ষিধেকে যে নিবৃত্ত করতে পারে নি তার পেট্রোগ্রাডের বাড়ীতে অনেক মহিলা সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন। সুন্দরী নারী কিংবা যুবতী দেখলে রাসপুটিন সব কিছু ভুলে গিয়ে তাকে উপভোগের জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। প্রার্থীনী হয়ে আসতেন এমন অনেক সুন্দরী মহিলাকে দেখা গেছে হাসি মুখে তারা রাসপুটিনের ঘরে ঢুকতেন; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যেত তারা ছুটে বেরিয়ে আসছেন। তাদের অবয়বে ভয়ের চিহ্ন, উৎকণ্ঠা। তাদের অনেকেই সোজা চলে যেতেন সামনের থানায়। পুলিস রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, থানায় অনেক মহিলা অভিযোগ করে গিয়েছিলেন যে, ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাসপুটিন চেষ্টা করেছিলেন সেই মহিলাকে ধর্ষন করতে। বলাৎকারের অভিযোগও বহু।

রাসপুটিনের বাড়ী পাহারা দেবার জন্য যে ডিটেকটিভদের রাখা হয়েছিল তাদের ডায়রীতে রাসপুটিনের দৈনন্দিন জীবনের মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যায়। তারা কি করছে না করছে সব সরকারী-ভাবে লিখে রাখতে হত। এমন কয়েকটি লেখায় দেখা যাচ্ছে, রাসপুটিন বাধা বন্ধনহীন, উচ্ছল, উদ্দাম, অসংযত জীবন যাপনে রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

একদিনের ঘটনা সম্পর্কে এই সব রেকর্ডে উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে,—এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। দেখতে শুনতে মোটামুটি ভালই। যুবতী এবং স্বাস্থ্যবতী। সবাই যেমন আসে। তিনিও তেমনি এসেছিলেন একটি আবেদন নিয়ে। তার স্বামী একজন লেপ্টেনাণ্ট। তাঁকে বদলী করা হয়েছে অন্যত্র। যদি রাসপুটিনকে ধরে করে কিছু করা যায়।

ভদ্রমহিলা রাসপুটিনের ঘরের কড়া নাড়তে একজন ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল। বলল, কি চাই ?

ভদ্রমহিলা জানালেন, তিনি রাসপুটিনের সঙ্গে দেখা করতে চান।

ভৃত্যটি তাকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে রাসপুটিন এলেন একটু পরে। ভদ্রমহিলা আগে কখনও রাসপুটিনকে দে নেনি, তবু একবার তাকিয়েই মনে হল, এ'ই সে। এর কাছেই এসেছি। রাসপুটিনের শাণিত দৃষ্টি, একমুখ দাড়ি, পেশাবহুল শরীর, অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে সে এত কাহিনী শুনেছে যে চিনতে একটুও সময় লাগল না।

রাসপুটিন ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে গেলেন। খুব কাছ থেকে তিনি ভদ্রমহিলার চোখের দিকে তাকালেন। একবার তাকিয়েই ভদ্রমহিলা চোখ নামিয়ে নিলেন। তার মনে হল, এমন জ্বলজ্বলে চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় নাকি ! রাসপুটিনের হাত

তার কাঁধ স্পর্শ করল। হাতটা আস্তে আস্তে যেন চামড়ায় কেটে বসতে লাগল। তার কানের কাছে মুখ এনে রাসপুটিন ফিস ফিস করে বললেন,—সব খুলে ফেল। তোমার সব জামা কাপড় এক এক করে খুলে ফেল।

ভদ্রমহিলার না বলার মত কোন ক্ষমতা ছিলনা। যন্ত্রচালিতের মত জামার বোতামে তিনি হাত দিলেন। রাসপুটিন একবারও জানতে চাইলেন না—সে কেন এসেছে, সে কি চায়! রাসপুটিন পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন এক এক করে বসন খুলে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলার মুখে কথা নেই, আপত্তি নেই। রাসপুটিন আরও কাছে ঝুঁকে এলেন। তার হাত দুটো ভদ্রমহিলার কাঁধ থেকে আর নিচের দিকে নেমে এল। ভদ্রমহিলার শরীরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াল। মাঝে মাঝে ফিসফিস করে বললেন,—চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে চলবেনা। আমাকে চুমো খাও, ভালবাস।

রাসপুটিন হঠাৎ উঠে গিয়ে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেন। বললেন, তোমার একটা সমস্যা আছে তার সমাধান চাই। এই তো! দাঁড়াও লিখে দিচ্ছি। তাহলেই মুস্কিল আসান।

রাসপুটিন কাগজে খস খস কি যেন লিখলেন তারপর ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিলেন। বললেন, আজ তুমি আমাকে পুরো আনন্দ দাওনি তাই এই চিঠি আজ তোমাকে দেবনা। কাল আবার এস, কাল এই চিঠি পাবে।

ভদ্রমহিলাটি আর আসেননি। পুলিশের কাছে পুরো ঘটনা জানিয়ে এসেছিলেন।

পুলিস রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, কেউ কেউ রাসপুটিনের ঘরে রাত কাটিয়ে যেত, রাসপুটিনকে তৃপ্ত করার জন্য অনেকেরই বাড়ী ফেরা হতনা রাত্রে। রাস্তা থেকে জুটিয়ে আনা মেয়ে থেকে

অভিনেত্রী, অচেনা, পরিচিতা কারো সম্পর্কে কোন অনীহা ছিলনা রাসপুটিনের।

ম্যারিয়া গিল নামে একজন ভদ্রমহিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি একজন ক্যাপ্টেনের স্ত্রী। যুবতী দেহে যেসব ভাঁজ খাঁজ দরকার—সবই তার ছিল। রাসপুটিনের কাছে তিনি গিয়েছিলেন। রাসপুটিন তাকে বলেছিলেন, আজ এখানেই থাকবে। আজ তোমার বাড়ী ফেরা হবেনা।

ভদ্রমহিলার সে রাতে আর বাড়ী ফেরা হয়নি। তিমি রাসপুটিনের সঙ্গেই ছিলেন, তাঁর শোবার ঘরে।

একবার গভীর রাত্রে রাসপুটিন একটি মেয়েকে নিয়ে এলেন বাড়ীতে। বাইরে প্রহরারত ডিটেকটিভের কপালে ভাঁজ পড়ল। এ কাকে এনেছেন রাসপুটিন! বাছ বিচার বলেও তো একটা কথা আছে নাকি? এই বিনোদিনী তো অতি কুখ্যাত। সহরে সুলভে যা যা পাওয়া যাওয়া তার মধ্যে এর দেহও আছে।

রাসপুটিন কোন দিকে তাকালেন না। তার হাত মেয়েটির কোমর জড়িয়ে আছে। মেয়েটি আড় চোখে প্রহরারত ডিটেকটিভের দিকে তাকাল। রাসপুটিন সোজা নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলে। দরাম করে দরজা আটকে দিলেন তিনি। তারপর আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

রাত্রির শেষ প্রহরে দরজা খুলে মেয়েটি নেমে এল। প্রহরারত ডিটেকটিভকে বলল, আমাকে একটু যেতে দেবেন।

ডিটেকটিভ ইঙ্গিতে বললেন, চলে যান।

ভদ্রমহিলা বললেন, এদিক দিয়েই যাবে তো।

ডিটেকটিভটি তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল, আমার পেছন পেছন আসুন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে আপনার নিশ্চয় খুব

অসুবিধে হবে না। নামার ব্যাপারটা তো আপনার জানাই আছে।

মেয়েটি আর কোন কথা বলেনি। সোজা বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

মাঝে মাঝে অশান্ত উদ্দাম রাসপুটিন ঘরের জানালা দরজায় দুমদাম ঘুসি মারতেন। প্রথম প্রথম প্রহরারত ডিটেকটিভরা চমকে উঠতেন। ব্যাপার কি? এত ক্ষেপে ওঠার কি আছে? ভোগ তো আজকেও এসেছিল। তবে কি উপভোগ ঠিকমত জমেনি?

পরে তারা ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিলেন। বার বার দেখতে দেখতে রহস্যটা পরিস্কার হয়েছিল। কোন মহিলা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে এলে তারা বুঝে নিতেন, রাসপুটিন পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হননি। দরজা জানালায় প্রতিটি ঘুসি তার অতৃপ্ত কামনারই বহিঃ প্রকাশ।

ডিটেকটিভরা অনেক সময় রাসপুটিনকে সাহায্য করতেন বলে তাদের প্রতি তিনি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। কখনও কখনও খোশ গল্পও করতেন। অবশ্য অকারণে নয়, ডিটেকটিভরা বেশ কয়েকবার রাসপুটিনকে সাহায্য না করলে তার পক্ষে বাঁচা মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে উঠত।

একদিন রাত্রে চারজন ডিটেকটিভ দেখতে পেলেন দুটি লোক এগিয়ে আসছে। দুজনেরই ভঙ্গি উত্তেজিত। দরজাতে তাদের আটকালেন ডিটেকটিভরা। বললেন, কি চাই?

একজন বললেন,—কোথায়! কোন ঘরে! আজ ওকে শেষ করে ফেলব একেবারে।

ডিটেকটিভরা এগিয়ে এলেন বললেন—কাকে?

—কাকে আবার! লোকটি বলে উঠল।—ওই পাজিটাকে রাসপুটিন কোন ঘরে আছে তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিন।

ডিটেকটিভদের দুজন দুই ভদ্রলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। বাকি দুজন রাসপুটিনের ঘরের দিকে ছুটলেন।

তারা ভদ্রলোকদের বললেন,—যাব, বললেই তো এখানে যেতে পারবেন না। এত রাতে কেন এসেছেন, ব্যাপার কি, সব বলুন। তারপর তো।

ভদ্রলোকটি বললেন, ঘরের কেচ্ছার কথা বাইরে বলা যায় নাকি? রাসপুটিনের ঘরে দুজন ভদ্রমহিলা ঢুকেছে দেখেননি নাকি! আমাদের দুই বৌ এখন ওর ঘরে। এত রাতে শোবার ঘরে কি হয় জানেন না নাকি? ওর মজা করা আজ ঘুচিয়ে দেব। ছাড়ুন একবার।

ডিটেকটিভরা বললেন,—এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? এভাবে রিভলবার হাতে নিয়ে আপনাদের তো আমরা যেতে দিতে পারিনা। আইন শৃঙ্খলা আপনি নিজের হাতে তুলে নেবেন, তাও তো চলতে পারেনা। একটু শান্ত হন তারপর অন্য কথা।

ওদিকে আর দুজন ডিটেকটিভ গিয়ে কড়া নাড়লেন রাসপুটিনের ঘরে। রাসপুটিন দরজা দিয়ে মুখ বের করে বললেন—ব্যাপার কি? এত রাতে?

ডিটেকটিভরা বললেন, ঘরে কি দু'জন মহিলা এখনও আছেন?

রাসপুটিন বললেন, হ্যাঁ। তাতে হয়েছেটা কি?

—তাদের স্বামীরা এসেছে। ওদের এখন এখানে দেখলে ঐ দুই ভদ্রলোক আপনাকে আস্ত রাখবেনা। বাগানের সিঁড়ি দিয়ে ভদ্র-মহিলাদের পাচার করে দিন।

রাসপুটিন দ্রুত ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলেন। একটু পরে দেখা গেল, পিছনের দরজা দিয়ে দু'জন মহিলা নামছেন। দ্রুত পায়ে চলে তারা গেলেন।

ঠিক তখনি সেই দুই ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বললেন,—কোথায়? এই ঘরে যারা ছিল, তারা কোথায়?

রাসপুটিন বললেন। কে ছিল? আমি ছাড়া আর তো কেউ ছিল না।

ডিটেকটিভরা বললেন, কি, আমরা বলেছিলাম না, মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছিলেন, এখন দেখলেন তো।

ভদ্রলোকদের আর কিছু করার ছিলনা। মাথা নিচু করে তারা বেরিয়ে এসেছিলেন।

অন্য একদিনের ঘটনা সম্পর্কে ডিটেকটিভদের রিপোর্টে লেখা ছিল,—গভীর রাতে রাসপুটিন ফিরে এলেন। একেবারে বদ্ধ মাতাল অবস্থা। হাঁটতে পা জড়িয়ে যাচ্ছিল, হোঁচট খাচ্ছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, কি হে, কেউ এসেছিল নাকি আমার কাছে?

রক্ষীদের একজন বলেছিল, কয়েকজন মহিলা এসেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য।

রাসপুটিনের চোখ চকচক করে উঠেছিল, বলেছিলেন, মহিলা! আহা, কখন এসেছিলেন—তারপর চোখ ছোট করে বলেছিলেন, মেয়েরা কেমন ছিল, সুন্দরীতো?

রক্ষীটি ঘাড় নেড়েছিলেন।

রাসপুটিন হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, আমার আবার সুন্দরী মেয়ে না হলে ইচ্ছে টিচ্ছে জাগেনা। সিধে কথা, সুন্দরী মেয়ে আমার ভাল লাগে, আমি ভালবাসি।

ডিটেকটিভরা ছায়ার মত রাসপুটিনকে অনুসরণ করতেন। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল, রাসপুটিনের জীবন যাতে বিপন্ন না হয় তার জন্য

যা যা করবার সব করবেন। সেই সঙ্গে সে কি করে না করে তারও বিস্তারিত বিবরণ দেবেন।

বিবরণ নিয়মিত লেখা হত। প্রতি দিনের তারিখ দিয়ে প্রতি ঘণ্টার বিবরণ লেখা হচ্ছে এটা রাসপুটিনও জানতেন না। এই বিবরণগুলো অবশ্য ডিটেকটিভদের কাছে থাকত না! প্রতিদিন সেটা চলে যেত ভারপ্রাপ্ত একজন অফিসারের কাছে। তার ওপর নির্দেশ ছিল, প্রতিদিন প্রতিটি রিপোর্ট পড়ে দেখবেন। মারাত্মক কিছু দেখলে জানাবেন। এই নির্দেশ অবশ্য জারের নয়, নির্দেশটি গোপনে দিয়েছিলেন পুলিস বাহিনীর প্রধান ডুনকোভস্কি।

এই রিপোর্ট সম্পর্কে অনেকের কৌতূহলের অন্ত ছিলনা। রিপোর্ট দেখতে পেলে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন তারা। মন্ত্রী থেকে শুরু করে বড় বড় ব্যবসায়ী পর্য্যন্ত—অনেকেই পড়ে ফেলেছিলেন ঐ সাংঘাতিক রিপোর্টগুলো। এক আধখানা নয়। প্রতিদিনই রিপোর্ট আসত। অভিযোগগুলো একই ধরনের,—আজও সে মাতলামি করেছে, মেয়ে ধরে এনেছে ঘরে বা ঘরে অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে আছে। প্রতিদিনই পাওয়া যেত নতুন নতুন নাম।

কেচ্ছা কাহিনী কখনও চাপা থাকেনা। রাসপুটিনের কাহিনীও চাপা থাকেনি। পিটার্সবার্গের বহু ঘরেই তখন একজনকে নিয়ে ফিসফাস। তার নাম রাসপুটিন। কবে কার সঙ্গে এবং কোথায় রাসপু[illegible] অ-কাজ কু-কাজ করেছেন সে সব কথা তখন মুখে মুখে ফিরত। রিপোর্টের কথাও ক্রমশ শোনা গেল। পিটার্সবার্গের কেউ কখনও এমন কথা শোনেনি। সারা দেশে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। এরকম স্বভাবের কোন মানুষ কখনও জার-অনুগ্রহ পায়নি। পিটার্সবার্গের ঘরে ঘরে তখন ক্ষোভ। চাপা উত্তেজনা। যে বাড়ীতে কোন সোমথ মেয়ে আছে সে বাড়ীর অভিভাবকদের চিন্তার অবধি ছিলনা। রাসপুটিন কাকে যে কখন টানবে কে [illegible]ানে! তার নামে নালিশ করেও তো কিছু হবে না। জারিনা আলেকজান্দ্রা কোন কথাই

মানবেন না। তিনি যে মনে করেন—রাসপুটিনের কোন দোষ নেই। তার কোন কাজে দোষ থাকতে পারে না।

অনেকে জানলেও আরও অনেকেই তখনও জানত না রাসপুটিনের এইসব গোপন অভিসারের কথা। সমাজের উচ্চবিত্ত মহলের অনেকে জানলেও নিম্নবিত্তদের মধ্যে তেমন করে জানাজানি তখনও হয়নি। এমনই এক সময় রাসপুটিন এমন একটা ঘটনা ঘটালেন যাতে বহুজনের সামনে তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল, উনিশশো পনের সালের এপ্রিল মাসের এক মনোরম সন্ধ্যায়।

সেদিন সন্ধ্যায় মস্কোর ইয়ার রেষ্টুরেণ্টে খুব ভিড় ছিল। রোজই সেখানে ভিড় থাকে। সবাই যায়, খায়-দায়, চলে আসে। রাসপুটিন সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। পাশের একটা ঘরে বন্দোবস্ত ছিল। সোজা সেখানে চলে গেলেন। খাবারের চেয়ে মদ্যপান তার বেশী পছন্দ। একটু খাওয়ার পর নেশা ধরে গেল। নেশা ধরে গেলে রাসপুটিন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। ইয়ার রেষ্টুরেণ্টে কোন ব্যতিক্রম হলনা। হঠাৎ ঝনঝন করে কাচ ভেঙে পড়ল শার্শির। সবাই সেদিকে তাকাল। এমন ঘটনা তো কোনদিন ঘটেনি সেখানে। রাসপুটিনের ঘর থেকে মেয়েলি গলায় চিৎকার শোনা গেল, তারপর পাওয়া গেল রাসপুটিনের গলা। কাকে যেন শাপমণ্যি করছেন। দরজায় ধপাধপ আওয়াজ হল। মনে হল, কে যেন দরজা খুলে বেরুতে চাইছে। বুজে আসা চিৎকার, মেয়েলি গলা, ভাঙ্গা কাচ, রাসপুটিনের অভিসম্পাত সব মিলিয়ে ইয়ার রেষ্টুরেণ্টের মানুষেরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

প্রথমে এগিয়ে গেলেন হেড ওয়েট্রেস। ম্যানেজার ছুটে গেলেন ফোনের কাছে। পুলিসকে জানালেন, তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ইয়ার রেষ্টুরেণ্ট থেকে বলছি। এখানে তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে।

ঘরের মধ্যে তখনও দাপদাপি চলেছে। হেড ওয়েট্রেস বললেন—এসব কি হচ্ছে কি! দরজা খুলুন।

কেউ দরজা খুলল না। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পৌঁছল। তারাও ঘরের দিকে ছুটে গেল। অনুরোধ করল, এখানে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। সবাই বলছে, ঘরের মধ্যে হচ্ছেটা কি? অনুগ্রহ করে দরজা খুলুন।

অন্য কেউ হলে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকার ব্যবস্থা করত। কিন্তু যেহেতু রাসপুটিন সম্পর্কিত ব্যাপার তাই সবাই সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। কারণ ঐসব কথা জারিনার কানে গেলে যে আবার বিপদ হতে পারে!

রাসপুটিন কারো কোন কথা শুনলেন না, দরজাও খুললেন না। অবস্থা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছিল। উপস্থিত অনেকে বললেন, আমরা এখানে খেতে এসেছি, এমন অসভ্যতা বরদাস্ত করতে আসিনি। হচ্ছেটাকি ঘরে? সবাই কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব নাকি ব্যাপারটা! পুলিশেরও কি কিছু করার নেই!

ইতিমধ্যে একজন গিয়ে সরাসরি ফোন করলেন আভ্যন্তরিন বিষয়ক মন্ত্রীকে। বললেন, এখানে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হচ্ছে, পুলিশ আছে কিন্তু কিছু করছে না।

মন্ত্রীটি একজন পুলিসকে ফোনে ডেকে বললেন, যা শোনা যাচ্ছে তা যদি সত্যি হয়, তবে কোন দ্বিধা না করে রাসপুটিনকে গ্রেপ্তার করুন। আমি বলছি।

উপরওয়ালার আদেশ মানতে হয়। সবাই তখন হাজির হলেন রাসপুটিনের ঘরের সামনে। বললেন, দরজা খুলুন। তা না হলে দরজা খোলার ব্যবস্থা আমরা করব।

কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে রাসপুটিন বাইরে বেরিয়ে আসতেই কয়েকজন পুলিশ তাকে ঘিরে ধরলেন।

রাসপুটিনের চোখ লাল, পা টলছিল। বললেন, একি! এসব কি হচ্ছে!

একজন পুলিস বললেন, এখানে যা কাণ্ড হয়েছে, তার জন্য আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে আপনাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবার জন্য।

রাসপুটিন ঘুরে তাকালেন, কাণ্ড! কাণ্ড মানে? একজন মহিলার সঙ্গে ঘরের মধ্যে রঙ্গরস করা! আরে, এ'রকমতো আমি রোজই করি। জারের সামনেই কত বার কত কাণ্ড করলাম।—পুলিসেরা প্রায় টানতে টানতে রাসপুটিনকে বাইরে নিয়ে গেলেন। তখনও রাসপুটিন সমানে বকে চলেছেন।

ডুবকোভস্কি যেন এরকম একটা ঘটনার অপেক্ষাতে দিলেন। আগের সমস্ত রিপোর্টের সঙ্গে এই ঘটনার রিপোর্ট নিয়ে তিনি জার নিকোলাসের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

ডুনকোভস্কির মুখে সব বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে জার চমকে উঠলেন। বললেন, সেকি! এ সব ঘটনা তো আমি জানিনা। এ সব সত্যি!

ডুনকোভস্কি বললেন, এই ফাইলের সব রিপোর্ট পড়ুন। দেখুন প্রতিদিনের কথা এখানে লেখা আছে। আর সেদিন ইয়ার রেষ্টুরেণ্ট যা ঘটেছে সেতো সকলের সামনেই ঘটেছে। সাক্ষীর অভাব নেই। আপনিই বলুন, এ সব কি সহ্য করা যায়! রাশিয়ার ঘরে ঘরে টি টি পড়ে গেছে। প্রকাশ্যে আপনাদের সম্পর্কে এরকম জঘন্য অপবাদে আমরা মর্মাহত।

জার নিকোলাসের কপালে ভাঁজ পড়েছিল চিন্তায়। তলব পাঠিয়েছিলেন রাসপুটিনকে।—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন। জরুরী কথা আছে।

রাসপুটিন এসেছিলেন। তার ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হলোনা কোন ঘটনা ঘটেছে বা তার কোন অনুতাপ হয়েছে।

জার নিকোলাস বিরক্ত মুখে বললেন, এসব কি শুনছি কি! ইয়ার রেষ্টুরেণ্টে আপনি কি করেছেন? শেষ পর্য্যন্ত নাকি পুলিসকে আসতে হয়েছিল?

রাসপুটিন অভিযোগকে কোন আমল দিলেন না। বললেন, সেদিন একটা যাচ্ছেতাই ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আসলে হয়েছে কি জানেন! আমি তো চাষাভুষো। এত দামি মদ খেয়ে আমার অভ্যেস নেই। আমাকে একজন বলল, আসুন না! ইয়ার রেষ্টুরেণ্টে দারুণ মদ খাওয়াব আপনাকে। আমি ও তার কথায় বিশ্বাস করে গেলাম। সে যে আমাকে সমানে খাওয়াচ্ছে আর আমিও খাচ্ছি সে খেয়াল তখন আমার ছিলনা। তারপর আমার আর কোন হুঁশ ছিল না। কি করেছি না করেছি কিছু মনে নেই। ছি, ছি, কি করলাম বলুনতো!

জার নিকোলাস আবার বললেন, সে সব কথা থাক, আমি শুনলাম আপনি আমার এবং আমার পরিবার নিয়েও নাকি আজে বাজে সব কথা প্রকাশ্যে বলেছেন।

রাসপুটিন যেন চমকে উঠলেন,—বাতুস্কা, আপনি একি বলছেন! আমি বলব আপনাদের সম্পর্কে! আমি কখনও বলতে পারি! আমি কি করলে আপনার বিশ্বাস হবে! -রাসপুটিন [illegible]ায় ঝোলান ক্রুশটা টেনে নিলেন। বললেন—আমি এই ক্রুশ ধরে বলছি, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, এরকম কথা আমি বলিনি, বলতে পারিনা।

জার নিকোলাস তখনও জারিনা আলেকজান্দ্রাকে এই রিপোর্টের কথা বলেননি। রাসপুটিনকে বলেছিলেন,—যাই হোক। আমি বলছি আপনি এখন কিছুদিন পেট্রোগ্রাডে থাকবেন না। আপনি থাকলে আরও গুজব ছড়াবে। আমি এটা চাইনা।

জারিনা আলেকজান্দ্রা আরও অ[illegible] পরে জানতে পেরেছিলেন ডুনকোভস্কির রিপোর্টের কথা। শুনে বিরক্তিতে ফেটে পড়েছিলেন।

বলেছিলেন, ডুনকোভস্কি রিপোর্টের নামে অ-সত্য পরিবেশন করেছে। ও আসলে আমাদের শত্রু। তা নইলে আমাদের বন্ধু সম্পর্কে এমন সব কথা কেউ বলে।

জারিনার যাকে ভাল লাগেনি তার পক্ষে রাশিয়ায় চাকরি বজায় রাখা সম্ভব ছিলনা। জারিনা মনে করেছিলেন. ডুনকোভস্কি তার শত্রু। ডুনকোভস্কিও তার চাকরি আর বেশীদিন বজায় রাখতে পারেন নি। উনিশশো পনের সালের সেপ্টেম্বর মাসে তার কাছে একটি সরকারী চিঠি পৌছেছিল, তাতে লেখা ছিল,……এত দ্বারা আপনাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল।

রাসপুটিন একটা কথা বুঝতে পেরেছিলেন, জারিনা আলেকজান্দ্রার যতদিন তার ওপর বিশ্বাস থাকবে, ততদিন রাশিয়ায় তার কোন ক্ষতি হবেনা।

জারিনার সঙ্গে কথাবার্তার সময় রাসপুটিন সজাগ থাকতেন যাতে তাঁর ভাব মূর্তি নষ্ট না হয়, যেন জারিনার মনে সন্দেহ না আসে—তার মনের ভেতর লুকিয়ে আছে কামমার উত্তাল ঝড়।

জারিনা তাকে জানতেন একজন সহজ সরল কৃষক হিসেবে, যার ওপর মঙ্গলময়ের অসীম কৃপা এবং যাকে মঙ্গলময় তার কাছে পাঠিয়েছেন তার স্ব-জন ও রাশিয়ার মঙ্গলের জন্য। জারিনা চিরদিন এই বিশ্বাস মনে রেখেছিলেন। তাই রাসপুটিন সম্পর্কে অজস্র অভিযোগকে তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন অনায়াস অবহেলায়। নিশ্চিত প্রমাণের সামনেও তিনি সেই বিশ্বাসের জোরে বলতে পেরেছিলেন, মিথ্যা, মিথ্যা, এযে মিথ্যা।

অবস্থা যখন জটিল হয়ে উঠছিল রাসপুটিন তার কথার ধারণ পাল্টে ফেলেছিলেন। জারিনা আলেকজান্দ্রাকে বলেছিলেন, এখন আমার অনেক শত্রু। শত্রুরা আমাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য তৈরী হয়ে আছে।

আপনি ওদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে পারেন, আবার নাও পারেন। যদি ওদের হাত থেকে আমাকে না বাঁচান তাতে অবশ্য আমার কিছু যাবে আসবেনা। আমি ঠিক বেঁচে যাব। কি করে বাঁচতে হয় তা আমি জানি। কিন্তু আপনি বাঁচবেন কি করে! আপনার স্বামী, পুত্রকন্যারাই বা বাঁচবে কি করে! আমি চলে গেলে আপনার জন্য আর কে প্রার্থনা করবে! আমায় প্রার্থনা ছাড়া আর কোন শক্তি আপনাদের রক্ষা করতে পারবে?

সন্ত হিসেবে জার পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলেও রাসপুটিনের প্রভাব রাজনীতি বা নিয়োগপত্রের মধ্যেও পরোক্ষভাবে দেখা গেল। অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছিল জারিনা আলেকজান্দ্রা প্রশ্রয়ের জন্য।

যাকে তার পছন্দ হত কিংবা তাকে যারা পছন্দ করতেন তাদের জন্য চেষ্টা তদবির করতে রাসপুটিনের আগ্রহ ছিল। তাদের জন্য জারিনার কাছে তিনি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠাতেন। জারিনা, জারের কাছে সেইসব চিঠি পৌঁছে দিতেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জার নিকোলাস স্ত্রীর অনুরোধ রাখতেন।

রাসপুটিন কি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কথা ভাবতেন? কেনই বা তিনি অনুগত লোকেদের পেশাগত উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত চিঠি পাঠাতেন! সম্ভবত রাসপুটিন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কথা চিন্তা করতেন না। তিনি চাইছেন, তার যেমন ইচ্ছে জীবন কাটাবেন। কেউ তাতে বাধা দেবেনা। অনুগত লোকজন চারপাশে থাকলে উটকো ঝামেলার সম্ভাবনা কম থাকবে—এই ভেবে অনুগত লোকেদের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা তিনি করতেন।

রাসপুটিনের মনে ইচ্ছে থাক বা না থাক রাজনৈতিক ব্যাপারেও অনেকসময় তিনি প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করতেন। এবং এক্ষেত্রেও জারিনা আলেকজান্দ্রার মাধ্যমে। যেমন দেখা যায়, উনিশশো পনের সালের অক্টোবরে যখন খাদ্য ও তেল এর জন্য রাশিয়ার ঘরে ঘরে হাহাকার—তখন রাসপুটিন জারিনাকে বলেছিলেন, আপনি জারকে বলুন কড়াভাবে এই অবস্থায় মোকাবিলা করতে। তাকে বলুন, আগামী তিনদিন সমস্ত যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল করে শুধু খাবার আর

তেল সরবরাহের বন্দোবস্ত করতে। দেরী হলে লোকজন ক্ষেপে উঠবে। এখনই ব্যবস্থা না করতে পারলে বিপদ হবে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়েও রাসপুটিন কথাবার্তা বলতেন। ডুমা'র ওপর তার কোন আস্থা ছিলনা। আস্থা না থাকার একটি ব্যক্তিগত কারণ ও ছিল। রাসপুটিন জানতেন, যতদিন জারও জারিনার হাতে ক্ষমতা থাকবে ততদিন তার ক্ষতি হবেনা। কিন্তু দায়িত্বশীল সরকারের হাতে দায়িত্ব থাকলে রাসপুটিনের অনেক অধিকার খর্ব হয়ে যাবে—এমন কি শাস্তিও পেতে হতে পারে।

ডুমা সম্পর্কে তিনি বলতেন,-ওরা বলে ডুমা হল প্রতিনিধি-মূলক সভা। শুনলে হাসি পায়। রাশিয়ার এখন সংখ্যা বেশী কাদের! চাষীরাইতো এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু ডুমাতে ক'জন চাষা আছে বলুন দেখি। প্রতিনিধিমূলক সভা বললেই তো আর হলো না। আমাকে বোঝান, কি কারণে এটাকে প্রতিনিধিমূলক সভা বলা যেতে পারে।

রাসপুটিন মূলত গ্রামের মানুষ। খুব ছোটবেলা থেকে শাসক বলতে তিনি জেনে এসেছেন জারকে। জারকে তিনি দেশে সর্বশক্তির আধার বলে মনে করতেন। ছোটবেলার এই বোধ তার মনের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল। ফলে তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন—ও সব ডুমা ঠুমা নয়। জারের হাতে ক্ষমতা থাকাই ভাল।

জার নিকোলাস একাধিকবার রাসপুটিনকে পিটার্সবার্গ ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন। অল্প দিনের জন্য হলেও রাসপুটিনকে চলে যেতে হয়েছিল। একবার রাসপুটিনের পাঠান চিঠি তিনি আনা ভিরুবোভার সামনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিলেন। রাসপুটিনের উপর নানা কারণে বহুবার তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন—তবু রাসপুটিনের সম্পর্কে কখনও কোন কড়া ব্যবস্থা নিতে পারেন নি। তার কারণ একটিই, আলেকজান্দ্রার প্রতি গভীর প্রেম। আলেকজান্দ্রার কোন অনুরোধে তিনি না বলতে পারতেন না। রাসপুটিনের যে সব অনুরোধ আলেকজান্দ্রার মারফত আসতো, যেমন কারো নিয়োগ পত্র বা কোন মন্ত্রী সম্পর্কে তার কোন বক্তব্য—নিকোলাস তা মেনে নিতেন। কখনও মেনে নিতেন সঙ্গে সঙ্গে, কখনও বা একটু দেরীতে। জার রাশিয়াতে শাসন করলেও তার শাসনের হাত লোকচক্ষুর আড়ালে পরিচালনা করতেন জারিনা আলেকজান্দ্রা। অবশ্য সে অধিকার তাকে দিয়েছিলেন জার নিকোলাস নিজে। একটি উনিশশো ষোল সালের তেইশে সেপ্টেম্বরের একটি চিঠিতে দেখতে পাচ্ছি, জার নিকোলাস লিখেছেন জারিনা আলেকজান্দ্রাকে—তোমার ওপর দায়িত্ব রইল, দেখ, মন্ত্রীসভায় যেন কোন অসন্তোষ না দেখা দেয়। এটা যদি কর তবে শুধু আমারই যে উপকার হবে তাই না রাশিয়ারও উপকার হবে।

জারিনা আলেকজান্দ্রা এই নতুন দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত শিক্ষা কখনও পান নি। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হতে হলে যে নিরাসক্ত, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি ও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকা দরকার, দুর্ভাগ্যবশতঃ তা তার ছিল না। শোনা কথায় তিনি গুরুত্ব

দিতেন খুব বেশী। অন্যের মুখের কথা শুনে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতেন। ফলে অনেক সময় এই সিদ্ধান্ত হতো একপেশে।

তার চেয়েও বড় কথা, যে যাই বলুক কিংবা যে সুপরামর্শই দিক না কেন, রাসপুটিনের প্রতিটি কথাকে তিনি গুরুত্ব দিতেন। রাসপুটিন তার কাছে খোলাখুলি বলতেন, কাকে তার ভাল লাগে কাকে লাগে না। তার ভাল লাগা বা না লাগা জারিনা আলেকজান্দ্রা ঈশ্বরের নির্দেশ বলে মনে করতেন। ফলে রাসপুটিনের ক্ষমতা ক্রমশ বাড়ছিল। তিনি জারিনাকে মুখে বলতেন বা চিঠি পাঠাতেন, অমুকের জন্য অমুক কাজ করলে আমি বাধিত হব......কিংবা অমুকের অমুক কাজটা করে দেবেন অনুগ্রহ করে।.. জারিনা আলেকজান্দ্রা সব অনুরোধই রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন।

খবরটা বাইরে জানাজানি হয়েছিল। আর হয়েছিল বলেই রাসপুটিনের কদর আরো বেড়েছিল। রাশিয়ার অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, রাসপুটিনকে দিয়ে একবার বলাতে পারলে কাজটা হাসিল হয়ে যাবে।—তখন রাসপুটিনের কাছে যারা আসতেন, তাদের মধ্যে ধর্মের কথা শোনার মত লোক খুব কম ছিলেন। তারা আসতেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। তা হল, স্বার্থসিদ্ধি। এই সিদ্ধির জন্য অনেকে অনেক নৈবেদ্য দিতেন। কেউ দিতেন ভাল মদ, সুগন্ধি নির্য্যাস, কেউ বা পরিপূর্ণভাবে নিজেকে।

অনুকূল পরিস্থিতির পরিপূর্ণ সুযোগ নিতে জানতেন রাসপুটিন। তার সম্পর্কে তদন্ত করতে চেয়েছিলেন পর পর দু-জন প্রধান মন্ত্রী। স্টোলিপিন ও কোকোস্তভ। তদন্তের রিপোর্ট যে তার পক্ষে ভাল হবে না এটা রাসপুটিন জানতেন। তিনি দেখেছিলেন, সেই দুই

প্রধান মন্ত্রীর কেউই চাকরী বজায় রাখতে পারেন নি। কেন পারেন নি তাও তিনি জানতেন, জারিনা আলেকজান্দ্রার তাদের ওপর বিরূপতা। আলেকজান্দ্রার মনের বিরূপতা এনে দিয়েছিলেন রাসপুটিন নিজেই।

রাজনীতিতে রাসপুটিন বিশেষ আগ্রহী বোধ না করলেও ক্রমশ রাজনীতির সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী গোরমিকিনকে ডুমা অপছন্দ করত। রাসপুটিনের আবার এই মানুষটিকে ছিল খুব বেশী পছন্দ। তিনি বার বার বলতেন, গোরমিকিনকে হারানো চলবেনা। জারের শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হলেন গোরমিকিন।

অবস্থা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল। ডুমার প্রধান মন্ত্রী গোরমিকিন দলের মধ্যে থেকেও ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছিলেন। তারই দলের লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলতেন। ছেয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ গোরমিকিনের পক্ষেও সম্ভব ছিল না যুবকের উদ্যমে কাজ করার। শাসন পরিচালনায় শৈথিল্য ঘটছিল, ডুমার গুঞ্জন বাড়ছিল। তবু গোরমিকিনকে হঠানো যাচ্ছিল না। ক্ষুব্ধ ডুমার সদস্যরা দেখেছিলেন, জার নিকোলাস টালবাহানা করছেন। তারা জানতে পেরেছিলেন, এই টালবাহানার মূল কারণ রাসপুটিন্। তার মাধ্যমে জারিনা আলেকজান্দ্রা প্রভাবিত করেছেন জার নিকোলাসকে।

গোরমিকিনের প্রধান মন্ত্রীত্ব বজায় রাখা যখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল তখন রাসপুটিন আর এক ফন্দি আঁটলেন। তিনি পিতিরিমকে ডেকে পাঠালেন। পিতিরিমের কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না রাসপুটিনের কাছে। রাসপুটিনই তাকে পেট্রোগ্রাডের অর্থডক্স চার্চের মেট্রোপলিটনের তখতে বসিয়েছিলেন। রাসপুটিন তাকে বললেন, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। কাজটা খুব গোপনীয়।

পিতিরিম জানতে চেয়েছিলেন, কী কাজ ?

রাসপুটিন খুব সংক্ষেপে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। গোরমিকিন

আর বেশীদিন টিকতে পারবেন না। অথচ অনুগত বা পরিচিত একজন প্রধান মন্ত্রী থাকার অনেক সুবিধা। তুমি এক কাজ করবে, জারের সঙ্গে দেখা করবে। এ-কথা সে-কথার পর স্তুরমের এর প্রশংসা করতে শুরু করবে। তারপর বলবে প্রধান মন্ত্রী হবার সব যোগ্যতাই স্তুরমের এর আছে।—তার মতামতটাও এ প্রসঙ্গে জেনে এস।

উনিশশো যোল সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাবৎ রাশিয়া বিস্মিত হয়ে শুনেছিল সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধ স্তুরমের নতুন প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। ডুমার সদস্যরা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। তারা মনে করলেন এই মনোনয়ণ ডুমাকে অপমানিত করেছে।

পরিস্থিতি যখন এরকম তখন রাসপুটিন জারিনা আলেকজান্দ্রাব মাধ্যমে জার নিকোলাসকে খবর পাঠালেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি এক দিন আচমকা চলে যান না ডুমার সভায়। দু'চার কথা বলে চলে আসবেন। দেখবেন এতে দারুণ কাজ হবে।

ফেব্রুয়ারীর বাইশ তারিখে নিকোলাস ডুমার সভায় না বলে কয়ে হঠাৎ হাজির হলেন। সেদিন ডুমার সদস্যরা 'রকে তুমুল অভিনন্দন জানিয়েছিল। জার এভাবে সভায় চলে আনবেন না বলে কয়ে—এটা তারা আশা করতে পারেননি।…

বোরিস স্তুরমের এর কাজকর্মের রেকর্ড যা ছিল তাতে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া চলতে পারে না। যে কাজেই তিনি হাত দিয়েছেন সে কাজই সফল হয় নি। রাজ্য পরিচালনায় কোন শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা তার ছিল না, তার সততা সম্পর্কেও নানা কথা শোনা যেত।

তবু এই লোকটিই রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী হলেন। জারিনা আলেকজান্দ্রা তাই চেয়েছিলেন। কারণ, এ যে রাসপুটিনের ইচ্ছা!

রাসপুটিন এবার আরও কয়েকটি কাঁটা সরাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তার স্বেচ্ছাচারী জীবন যাত্রায় যে বাধা দিত তাকেই তিনি এক হাত দেখে নিতে চাইতেন।

পলিভানভ তখন রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। রাসপুটিনকে তিনি বেশী আমল দিতেন না। ডুমার প্রতি তার আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। এক দিন পলিভানভ জানতে পারলেন, রাসপুটিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের চারটি গাড়ী ব্যবহার করছেন। এই গাড়ীগুলো ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী স্তুরমের। পলিভানভ বললেন, এসব চলবে না। যা ইচ্ছে তাই হতে দেওয়া যায় না। গাড়ীগুলো অবিলম্বে ফেরত আনুন।

রাসপুটিন গাড়ী ফেরত দিয়েছিলেন। তবে চুপচাপ বসে থাকেন নি। জারিনা আলেকজান্দ্রাকে বলেছিলেন, পলিভানভ আমার গাড়ীগুলো কেড়ে নিয়েছে। আমাকে অপমান করবার জন্যই সে একাজ করেছে।

জারিনা আলেকজান্দ্রা রাসপুটিনের এই অপমান সহ্য করতে পারেন নি। জার আলেকজান্দ্রাকে জানিয়েছিলেন, পলিভানভ ভাল লোক নয়। ওর থেকে সাবধান থেক। ওকে আর বাড়তে দিও না।

ফলে যা হবার তাই হয়েছিল। পঁচিশে মার্চ একটি চিঠি পেয়েছিলেন পলিভানভ। তাতে লেখা, আপনি দেশের জন্য অনেক

কাজ করেছেন।……কিন্তু আপাতত আপনাকে দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে

নিজের হাত শক্ত করার জন্য ডুমার ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রটোপোপোভের দিকে তারপর হাত বাড়ালেন রাসপুটিন। জারিনাকে তিনি বোঝালেন, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে প্রটোপোপোভের চেয়ে দক্ষ লোক রাশিয়ায় পাওয়া খুব কঠিন। অথচ স্বরাষ্ট্র দপ্তর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারটা এই দপ্তরই দেখে।

জারিনা আলেকজান্দ্রা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জারকে জানিয়েছিলেন, ডুমার ভাইস-প্রেসিডেন্ট যে একজন দক্ষ লোক এ বিষয়ে তোমার মনেও নিশ্চয় কোন সন্দেহ নেই। প্রটোপোপোভকেই স্বরাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব দাও না কেন!

স্বরাষ্ট্র বিষয়ের নতুন মন্ত্রীর নাম খুব শীগগীরই ঘোষণা করা হয়েছিল, বলা হয়েছিল, ডুমার ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রটোপোপোভ এতদ্বারা নতুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করছেন।

ডুমাতে হৈ চৈ পড়ে গেল, ডুমা স্তুরমের এর বিরোধিতার পথে এগুচ্ছিল ধীরে ধীরে। স্তুরমেরের কাজে পরিপূর্ণ অসহযোগিতার জন্য তারা তৈরী হচ্ছিলেন। সে সময় খবর এসে পৌছল, ডুমারই ভাইস-প্রেসিডেন্ট মাথা মুড়িয়ে স্তুরমেরের খোয়াড়ে ঢুকেছেন।

ডুমার একজন সদস্য প্রটোপোপোভকে বললেন, আপনি একজন বিশ্বাসঘাতক। এতবড় বিশ্বাসঘাতকতার নজির ডুমার ইতিহাসে

নেই। আপনি কি করে রাজি হলেন! এর চেয়ে কলঙ্কজনক সিদ্ধান্ত আর কি হতে পারে!

প্রটোপোপোভে বলেছিলেন, কেন, দোষের কি হয়েছে? ডুমার ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকতে পারি তাতে দোষ নেই, মন্ত্রী হলেই দোষ। না। পদত্যাগ আমি করবো না। সজ্ঞানেই আমি এই পদ গ্রহণ করেছি।

ডুমার সদস্যদের মনে যখন তীব্র অসন্তোষ, জারের সঙ্গে যখন তাদের সম্পর্ক সবচেয়ে তিক্ত হয়ে উঠছিল, সেই সময় একজনের মনে অনাবিল শান্তি বিরাজ করছিল। তার নাম জারিনা আলেকজান্দ্রা।

উনিশশো ষোল সালের অক্টোবরের প্রসন্ন দিনগুলো তার কাছে উদ্বেগহীন সুখকর প্রহরের আস্বাদ এনে দিয়েছিল। স্তুরমের ও প্রটোপোপোভে বিশ্বস্ত এই দু-জনকে পাওয়া গিয়েছিল রাসপুটিনের সুপারিশে। জারিনা ভাবছিলেন, রাসপুটিন তার অলৌকিক ক্ষমতা-বলেই ঠিক মানুষকে ঠিক সময় চিনতে পারেন। তা না হলে স্তুরমের বা প্রটোপোপোভের নাম আর কারো মনে না এসে শুধু ওনার মনেই বা আসবে কেন?

অন্যদিকে, রাশিয়ায় তখন ভাঙ্গন শুরু হয়েছিল। জার ও জারিনার সিদ্ধান্ত তখন নিশ্চিতভাবে তাদেরকে ভুলের চোরা বালির দিকে টেনে নিয়ে চলছিল।

স্তুরমেরের অপদার্থতা প্রতিদিন ধরা পড়ছিল। কোন দায়িত্বই সে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারছিল না। শান্তি শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। মার্সেইলেস থেকে খবর এল, এক ব্রিগেড রাশিয়ান সৈন্য বিদ্রোহ করেছে। পেট্রোগ্রাড থেকে খবর এল ধর্মঘটী শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করার নির্দেশ উপেক্ষা করে দুই ইনফ্যানট্রি ডিভিশন সৈন্য বিদ্রোহ করেছে। সেই সঙ্গে খবর এল, বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা— প্রধান মন্ত্রী স্তুরমেরের ব্যক্তিগত সচিব একটি ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করেছেন।

সমস্যা আরও মারত্মক হয়ে উঠল যখন জানা গেল জ্বালানি ও ধাতুর ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিয়েছে হঠাৎ।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রতিরক্ষা কারখানায় ক্রমাগত গোলা-গুলি উৎপাদন করতে হয়। রাশিয়াতেও তাই হচ্ছিল। হঠাৎ কল-কারখানা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হল। লোহা ও তামার ব্যাপক ঘাটতির মুখে এসে জার দিশেহারা বোধ করছিলেন। কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ডুমা দাবি করল, দেশের এরকম ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য যে দায়ী তার অপসারণ চাই।

নিকোলাসের কাছে তখন অন্য কোন পথ ছিল না। তিনি দেখলেন এতদিন অসন্তোষ ছিল শুধু ডুমাতে। সেখানেই শুধু শোনা যেত স্তুরমের এর অপদার্থ। এখন সমস্ত দেশজুড়ে একই কথা শোনা যাচ্ছে। দেশের কারো ওর ওপর আস্থা নেই। আপাতত ওকে কিছুদিন অন্তত ছুটি দিয়ে দেখা যাক। যদি অবস্থা পাল্টায় তবে না হয় আবার ওকে ডাকা যাবে।

জার নিকোলাসের এই ইচ্ছেতে জারিনার পরিপূর্ণ মত ছিল। শুধু রাসপুটিন একটু খুঁতখুঁত করছিলেন। তিনি জারিনাকে বলেছিলেন, একেবারে ছুটি দিয়ে দেবেন কেন! তার চেয়ে বরঞ্চ ওর

হাত থেকে পররাষ্ট্র দপ্তরটা নিয়ে নিন। ভুমার গোঁসাও এতে কমবে।

জার নিকোলাস তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নি। স্তুরমেরকে বিদায় নিতে হয়েছিল। নতুন প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন আলেকজাণ্ডার ট্রেপভ।

আলেকজাণ্ডার ট্রেপভ কড়াধাতের মানুষ ছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি ঠিক করেছিলেন প্রশাসনকে রাহুমুক্ত করতে হবে। রাসপুটিনের সমস্ত প্রভাব খর্ব করতে হবে। ওকে শায়েস্তা করতে হবে।

আলেকজাণ্ডার ট্রেপভ দায়িত্ব নেবার সময় জারকে বলেছিলেন—আপনার কথায় আমি দায়িত্ব নিতে পারি। কিন্তু একটি সর্তে। আমার কথা আপনাকে রাখতে হবে।

জার নিকোলাস রাজি হয়েছিলেন।

ট্রেপভ দায়িত্ব নেবার পর জারকে জানালেন, প্রটোপোপোভেকে রেহাই দিন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে আরও শক্ত হাতে পরিচালনা না করতে পারলে দেশে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না।—আসলে রাসপুটিন মনোনীত এই লোকটিকে অপসারিত করে রাসপুটিনকে প্রথম আঘাত হানতে চাইছিলেন ট্রেপভ।

জার নিকোলাসও বুঝতে পেরেছিলেন, আইন-শৃঙ্খলা সত্যিই ভেঙ্গে পড়ছে। এখনই অবস্থা আয়ত্বে আনতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তিনি বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছিলেন।

জারিনা আলেকজান্দ্রা এই খবর শুনে বিস্মিত বোধ করেছিলেন। তিনি নিকোলাসকে লিখেছিলেন, এসব কি শুনছি? যা শুনছি তা কি

সত্যি ? ওকে একদম বিতারিত করে দিওনা। বরঞ্চ অন্য কোন দপ্তর দাও ওকে। খাদ্য সরবরাহের দপ্তরওতো দিতে পার।

জার নিকোলাস কথা দিয়েছিলেন ট্রেপভকে। কিন্তু জারিনা আলেকজান্দ্রাকেও ফিরিয়ে দিতে পারেন নি। ফলে ট্রেপভের অনুরোধ আর রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। জারিনার ইচ্ছারই জিত হয়েছিল। প্রটোপোপোভে থেকে গিয়েছিলেন।

রাশিয়ায় ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল খবরটা, জার নয়, জারিনার ইচ্ছাই রাশিয়ায় আদেশ। জারিনাকে পরিচালনা করছেন একজন ভ্রষ্ট, ভণ্ড, লম্পট, বদমাইস মানুষ, রাসপুটিন।

রাসপুটিনের ওপর তখন রাশিয়ার মানুষদের যত ঘৃণা, জারিনা আলেকজান্দ্রা ও জার নিকোলাস সম্পর্কেও তাদের মনে ততটাই ঘৃণা জমেছিল। জার পরিবারের প্রতি তাদের দীর্ঘদিনের অনুরাগ তিক্ত, বীতরাগে রূপান্তরিত হয়েছিল।

জার পরিবারের যে মানুষটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, রাসপুটিন একজন ভণ্ড, শয়তান, এবং তার হাত থেকে রাশিয়াকে বাঁচাতে হবে—তার নাম ফেলিক্স ইউসাউপভ।

ফেলিক্সেরও স্বভাব চরিত্রের কোন বালাই ছিল না। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রিন্স ফেলিক্সের টাকার কোন অভাব ছিল না। যখন বয়েস সবে বারো তখনই সে প্রথম নারী দেহের স্বাদ চেখে নিয়েছিল। পনের বছর বয়সে সে গিয়েছিল ইটালি। ইটালির সূর্য্য করোজ্জ্বল আবহাওয়ার সঙ্গে তার ভাল লেগেছিল ইটালি দুহিতাদের সুন্দর চেহারা। বন্ধুত্ব করতেও দেরী হয়নি, বান্ধবীর সংখ্যা বাড়ছিল দিন দিন।

এহেন ইউসাউপভের সঙ্গে রাসপুটিনের প্রথম দেখা হয়েছিল ইউসাউপভের বিয়ের আগে। রতনে রতন চিনেছিল। প্রথম আলাপের পর দেখা গেল দুজনের মাঝে মাঝেই দেখা হচ্ছে। গভীর রাতে তাদের অনেকদিন দেখা যেত নগর-নটীদের দুয়ারে। দুজনেরই স্খলিত স্বর, টলমল পা, মদির দৃষ্টিতে কামনা।

এই বন্ধুত্ব বেশীদিন টেকেনি। সামান্য কথা থেকে মতবিরোধ আর এই মত বিরোধ থেকে দেখা দিয়েছিল সম্পর্কের চিড়। রাসপুটিন প্রায়ই তাকে বলতেন, বুঝলে, জারিনা অতি বিচক্ষণ মহিলা। আমার কি মনে হয় জান? জার নিকোলাসের উচিৎ এখন সিংহাসনে আলেক্সিকে বসিয়ে—সরে আসা। জারিনা আলেকজান্দ্রা রাজত্ব চালিয়ে যেতে পারবে যতদিন না আলেক্সি বড় হয়। তাতে ভালই হবে, বুঝলে।

ইউসাউপভ ব্যাপারটা বুঝতে চাইতেন না। তাছাড়া, তার রাজ রক্তে রাসপুটিনের কথা জ্বালা ধরিয়ে দিত। তখতের দিকে তারও চোখ ছিল। রাসপুটিন সেদিকে তাকে আমল দিচ্ছেনা দেখে সে বিরক্ত হত। মুখে অবশ্য সে কিছু প্রকাশ করত না।

একবার ইউসাউপভের অসুখ করল। রাসপুটিনের তখন দারুন নাম ডাক। সে নাকি শিওরে এসে দাঁড়ালে অসুখ সেরে যায়, সে যদি একবার প্রার্থনা তবে রোগী ভাল হয়ে উঠবেই। ইউসাউপভের বিছানার পাশেও রাসপুটিন এসেছিলেন। সেদিনের কথা ইউসাউ-পভের জবানীতেই পাওয়া যায়, ইউসাউপভ বলেছেন—রাসপুটিন আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, তোমার কি হয়েছে? কিছু হয়নি, যাও সামনের ঐ সোফায় গিয়ে শুয়ে পড়। আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাসপুটিন আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু এ কি রকমভাবে সে তাকাচ্ছে—আমি বিস্মিত বোধ করছিলাম। ওর চাউনি, কথা, সব আমার পরিচিত। কিন্তু আজ ও যখন আমার দিকে তাকাচ্ছিল তখন যেন আমার চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে সে আমার শরীরে হাত বুলোতে শুরু করল। মাথায়, চোখে, পিঠে, গায়ে সে হাত বুলিয়ে দিল। আমার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি বুঝলাম আমার চোখ বুজে আসছে, ঘুম ঘুম ভাব, তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল। আমি তাকাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওর চোখ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। বুঝতে পারছিলাম, আমি আস্তে আস্তে সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছি। আমার যেন উঠবার ক্ষমতা লোপ পাচ্ছিল। কিছু বলতে পারছিলাম না। কানে যাচ্ছিল রাসপুটিনের গলার

স্বর। খুব স্পষ্ট নয়। বুঝতে পারছিলাম না কি বলছে না বলছে, তবু ওর গলা চিনতে পারছিলাম। আমি প্রাণপন চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে নাকি সম্মোহন কাটাতে পারি। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা চালানোর পর রাসপুটিন ক্ষান্ত হলে, বলল,—আজ আর কিছু দরকার নেই। দেখো, তুমি ভাল হয়ে যাবে।

ডিসেম্বরের তিন তারিখে পুরিশকোভিচের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন প্রিন্স ইউসাউপভ। উত্তেজনার ছাপ তার চোখে মুখে। বলেছিলেন, খুব জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে।

পুরিশকোভিচ জানতে চেয়েছিলেন,—কি কথা, বলুন।

ইউসাউপভ বলেছিলেন,—রাসপুটিন সম্পর্কে একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি রাশিয়ায় শান্তি বজায় রাখতে হয় তাহলে ওকে মারতে হবে।

পুরিশকোভিচ বলেছিলেন,—এ কথায় আমি আপনার সঙ্গে একমত।

ইউসাউপভ হঠাৎ বলে উঠেছিলেন, আমি রাসপুটিনকে খুণ করবার একটা পরিকল্পনা করেছি। আমি আর আমার বন্ধুরা সেটা করব। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন এ ব্যাপারে!

পুরিশকোভিচ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আর এই ব্যাপারটা নিখুঁত পরিকল্পনা ছাড়া যে হবেনা—তাও আমি বিশ্বাস করি।

পুরিশকোভিচ উদ্যোগী হলেন, একান্ত গোপনীয় এই পরিকল্পনায় যোগ দিলেন আঁরো তিনজন, সুখোটিন নামে একজন অফিসার,

একজন ডাক্তার—নাম ল্যাজোভার্ট এবং গ্র্যাণ্ড ডিউক ডিমিট্রী পাভলোভিচ। এবং তিনজনই বলেছিলেন, রাসপুটিন হত্যা চক্রান্তে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ আমরা দুর্লভ সুযোগ বলে মনে করি।

ডিসেম্বরের কনকনে শীতে এই পাঁচজন মানুষ দিনের পর দিন দেখা করতেন, আলোচনা করতেন, কি করে হত্যা করা হবে, মৃতদেহ কিভাবে সরিয়ে ফেলতে হবে, পুরো ব্যাপারটা কতক্ষণের মধ্যে সারতে হবে—সব কিছু।

দিন অবশেষে নির্দ্ধারিত হল। উনত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের নিচে চৌকো দাগ এঁকে দিলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক ডিমিট্রী। কোথায় ঘটনাটা ঘটবে সেটাও ঠিক করা হল। ইউসাউপভের মইকা প্যালেসে চমৎকার সেলার আছে। নির্জনও বটে। সেখানে মদ্য পানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হবে রাসপুটিনকে। রাসপুটিন ভাল মদ পেলে আর কিছু চায়না। মদ খেতে খেতে যখন মাতাল হয়ে যাবে তখন আসল কাজ শুরু করা হবে। মদের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হবে। সেই বিষ একবার গলা দিয়ে নামলে রাসপুটিনের চোখ চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

ডিসেম্বরে বরফ পড়তে শুরু করল। গাছে, রাস্তায়, কার্নিসে-সর্বত্র বরফের চাদর। একদিন বরফ ঢাকা রাস্তায় দিকে তাকিয়ে রাসপুটিনের মনে হল, তার সামনে বিপদ, মৃত্যু তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ডুমায় তাকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে তিনি জানতেন, অনেকে জার ও জারিনার কাছে তার নাম নালিশ করেছে একথা তিনি

শুনেছিলেন। ডিসেম্বরের বরফ ঢাকা রাস্তা, বাড়ীর দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়েছিল সে সব কথা। মনে হয়েছিল, জীবনে হয়ত আর কোন ডিসেম্বর ফিরে আসবেনা এমন বরফ পড়াও আর দেখা হবে না! পৃথিবীর এত রং, রস সব মিলিয়ে যাবে চোখের সামনে থেকে।

অন্যদিকে পুরিশকোভিচ উত্তেজনায় ছটফট করছিলেন, অন্য সবার মত জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি প্রায়ই একে ওকে বলতেন, দেখবেন রাসপুটিন বাঁচবেনা। হয়ত কোনদিন শুনবো তাকে কে মেরে ফেলেছে। সবাই যা চটে আছে।

ডুমা থেকে এই সব কথা রাসপুটিনের কাছেও এসে মাঝে মাঝে পৌঁছত। রাসপুটিন যেন বুঝতে পেরেছিলেন, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। মৃত্যুর ফাঁদ হয়ত কোথাও পাতা রয়েছে। তিনি সতর্ক হয়েছিলেন! দিনের বেলা পারতপক্ষে তিনি আর বের হতেন না। অন্যমনস্ক থাকতেন।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে রাসপুটিন জার নিকোলাসের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। বিস্ময়কর চিঠি। যেন ভবিষ্যৎ এর দিন গুলোকে চোখের সামনে দেখেছিলেন রাসপুটিন, যেন জানা ছিল, কি ঘটতে যাচ্ছে। তিনি লিখেছিলেন—আমি শুনতে পাচ্ছি শেষের ঘণ্টা, আজ সময় এসেছে, যখন আমি আপনাকে, মাতাস্কা জারিনা ও দেশের লোকদের কয়েকটা কথা জানিয়ে যাব। যদি আমাকে আমার কৃষক ভাইয়েরা হত্যা করে, যদি মাঠে কাজ করা হাতগুলো নির্মমভাবে আমার উপর নেমে আসে, তবে তাতে আপনার আশঙ্কিত হবার কিছু নেই। কিন্তু আমার ঘাতক যদি সম্ভ্রান্ত বংশীয় হয়, যদি তার শিরায় প্রবাহিত হয় রাজ রক্ত—তবে জানবেন সামনে রয়েছে ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ের কয়েকটি বছর। ঘরে ঘরে হবে হানাহানি, হত্যা, মৃত্যু হবে নিয়মিত ঘটনা। আপনি যদি শুনতে

পান আপনার অংশের কেউ আমার ঘাতক তাহলে মনে রাখবেন, আপনারও নিস্তার নেই। আমার মৃত্যুর দুবছর পরে আপনি জারিনা, ছেলেমেয়ে কেউই বেঁচে থাকবেন না। যেমন ভাবে আমাকে হত্যা করা হবে তেমনই নির্মমভাবে আপনাকেও হত্যা করা হবে। কেউ বাঁচেবেনা। এখন আমি আর জীবিত নেই, মৃত মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকে এই চিঠি আপনাকে লিখছি।

অবশেষে দিন এগিয়ে এল। ইউসাউপভ রাসপুটিনকে আমন্ত্রণ জানালেন, অনেকদিন একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া হয়না। আসুন না আমার মইকা প্যালেসে একদিন। একেবারে মাইফেল বসিয়ে দেব।

—মাইফেল? রাসপুটিন প্রশ্ন করেছিলেন।

—হ্যাঁ। বলেছিলেন ইউসাউপভ।—বলেছিলেন, আমি জানি আপনার কি দরকার। সুন্দরী মেয়েতো? থাকবে, সে বন্দোবস্তও থাকবে। সুন্দরী প্রিন্সেস ইরিনা সেদিন আমাদের মধ্যে থাকবেন।

সুন্দরী ইরিনার প্রতি রাসপুটিনের অসীম দুর্বলতা ছিল, ইউসাউপভের এই স্ত্রীর দেহ সৌন্দর্য্যের কথা [illegible]বাদে পরিণত হয়েছিল। রাসপুটিন ভেবেছিলেন, এমন মেয়ের সঙ্গ কিছুক্ষণের জন্য পেলেই বা মন্দ কি! স্নায়ুর ওপর যা চাপ পড়ছে।

রাসপুটিন আনা ভিরুরোভাকে বলেছিলেন, ইউসাউপভ আমাকে নেমন্তন্ন করেছে। মইকা প্যালেসে খাওয়াবে। আমি যাচ্ছি।

আনার সন্দেহ হয়েছিল, হঠাৎ ইউসাউপভ এতদিন পরে কেন

আবার নিমন্ত্রণ করেছেন রাসপুটিনকে ! বলেছিলেন, আপনি যাচ্ছেন নাকি !

রাসপুটিন বলেছিলেন, হ্যাঁ।

আনা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন,—আপনি যাবেন না, ইউসাউপভ কখন যে কি করে বসে তার ঠিক নেই। ওর ব্যাপার স্যাপার তো আপনি জানেন।

—আরে ইরিনা আসবে আর আমি যাব না, তা হয় নাকি !

আনার কোন কথাতেই কাজ হয়নি। রাসপুটিন ঠিক করেছিলেন যাবেনই।

আনা গিয়ে বলেছিলেন জারিনাকে—ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না। ইউসাউপভ নেমন্তন্ন করেছে রাসপুটিন মইকা প্যালেসে। সেখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত খানাপিনা হবে। প্রিন্সেস ইরিনাও নাকি থাকবে।

আলেকজান্দ্রা বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, সে কি ! ইরিনাতো এখন এখানে নেই, নিশ্চয় কোথাও কিছু গোলমাল হতে যাচ্ছে।

জারিনা বিড়বিড় করে বলেছিলেন, রহস্যময় ব্যাপার। ইরিনা কি করে থাকবে। সে তো এখন দূরে আনা।

সন্ধ্যের আগে আগেই মইকা প্যালেসের সব বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলা হয়েছিল। গ্রানাইটের মেঝের ওপর পালিস করা কাঠের

চেয়ার। টেবিলে অসামান্য কারুকাজ। ঘরের মধ্যিখানে একটি টেবিল। এই টেবিলেই সবার বসবার কথা। এই টেবিলেই রাসপুটিনের অধরে শেষ পানীয়ের স্বাদ পাবার কথা।

রাসপুটিন যা যা ভালবাসতেন ইউসাউপভ সে সব কিছুই এনে রেখেছিলেন। টেবিলের ওপরে থরে থরে কেক সাজান, বিভিন্ন মাপের, বিভিন্ন আকারের মদের বোতল, গ্লাস।

ইউসাউপভ খুব সাবধানে ছোট একটা কৌটো টেবিলের ওপর রাখলেন। কৌটার মধ্যে মারাত্মক বিষ। হাতে গ্লাভস পড়ে এগিয়ে এলেন ডাক্তার ল্যাজোভার্ট। খুব সন্তর্পনে কেকের ওপরে ছিটিয়ে দিলেন সেই বিষ। নেড়ে চেড়ে প্রতিটি কেকেই ছেটান হল। ডাক্তার ল্যাজভার্ট পরে বলেছিলেন, এই বিষ জিভে একটু ঠেকলে কেউ বাঁচতে পারে না। আর যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে কারো আর বাঁচার কোন পথ ছিল না।

রাসপুটিন গভীর নিশীথের পানীয় আসরের জন্য নিজেকে সাজিয়ে গুজিয়ে নিচ্ছিলেন। ইউসাউপভ তাকে নিয়ে যাবার জন্য যখন এলেন তখন রাসপুটিন জামা কাপড় পরে তৈরী হয়ে আছে যাবার জন্য। তার গায়ে শস্তা সাবানের গন্ধ। পায়ে বুট জুতা। কালো ভেলভেটের প্যাণ্ট ও সিল্কের কামিজ গায়ে।

ইউসাউপভ রাসপুটিনকে সোজা খাবার ঘরে নিয়ে এলেন। সেলারের মধ্যে ঢুকে ইউসাউপভের উত্তেজনা বেড়ে গিয়েছিল। টেবিলের বিষ মাখান কেকের দিকে আঙ্গুল তুলে তিনি রাসপুটিনকে বলেছিলেন, আপনার পছন্দমত সব কেক এনে রেখেছি। আপনি এগুলো একটু চেখে দেখুন। প্রিন্সেস ইরিনাও আর কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাবেন।

রাসপুটিন বললেন, ঠিক আছে, প্রিন্সেস না আসা পর্য্যন্ত আমরা বরঞ্চ অপেক্ষা করি।

ইউসাউপভ বললেন, তার কোন দরকার নেই। আমি তো আছি। আমার অনুরোধ, আপনি লৌকিকতা করবেন না। খাওয়া শুরু করুন ইরিনা এল বলে।

রাসপুটিন দুটি কেক তুলে নিলেন। চিবুতে শুরু করলেন। ইউসাউপভ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলেন। এই কেক জিভে ঠেকলেই মরে যাওয়ার কথা, রাসপুটিন চিবিয়ে চিবিয়ে সেই কেক খেয়ে ফেললেন। তার মুখে গ্যাঁজলা উঠল না। কোন যন্ত্রণার চিহ্নও দেখা গেল না। বিষমাখান কেকগুলোকে তিনি অমৃতের মত আরাম করে খেলেন। ইউসাউপভের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল ডিসেম্বরের সেই ঠাণ্ডা রাত্রিতেও।

রাসপুটিন মদ চাইলেন। মদের মধ্যেও বিষ মেশানো ছিল। ইউসাউপভ মদ এগিয়ে দিলেন। এক চুমুকে এক গ্লাস খেয়ে নিলেন রাসপুটিন। ইউসাউপভ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে এমন ঘটনাও ঘটতে পারে। একটা লোক এত বিষ হজম করতে পারে।

রাসপুটিন আরও একগ্লাস মদ চাইলেন। নিমেষে গিলে ফেললেন। ইউসাউপভ ভাবছিলেন, এবার রাসপুটিন গোঙাতে শুরু করবেন, তার মুখে গ্যাজলা উঠবে। তিনি মারা যাবেন। কিন্তু কিছুই হল না। রাসপুটিন ইউসাউপভকে বললেন, গিটারটা নিয়ে একটু গান শোনাও না।

ইউসাউপভ গান শোনাতে লাগলেন। বিস্ময়ে তিনি তখন হতবাক। বুঝে উঠতে পারছিলেন না—চোখের ওপর যা ঘটছে তাকি সত্যি! ইউসাউপভ যখন গান শোনাচ্ছেন তখন দলের আর চারজন বিস্মিত হয়ে ভাবছিলেন, এখনও সব শেষ হচ্ছে না কেন! ইউসাউপভ আর কতক্ষণ গান গাইবে!

দেখতে দেখতে দুটি ঘণ্টা কেটে গেল। ইতিমধ্যে রাসপুটিন আরও কয়েকটি কেক ও কয়েক গ্লাস পানীয় খেয়েছেন। ইউসাউ-পভের স্নায়ুতে আর কোন শক্তি ছিল না। রাসপুটিনকে একটু বসতে বলে সে ছুটে দোতলায় চলে গিয়েছিল। ল্যাজোভার্ট সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ইউসাউপভকে দেখে বললেন, কি হল! সব ঠিকমত চলছে তো!

—কোথায়! বিষ মাখানো কেক, মদ হজম করে বসে আছে রাসপুটিন, এক নিশ্বাসে বলেছিলেন ইউসাউপভ।

এঁ্যা! সে কি! ডাক্তার ল্যাজোভার্টের তখন অজ্ঞান হবার অবস্থা। ধপ করে বসে পড়লেন। বললেন, বলেনকি! সব হজম করে ফেললে! কি করে করল!

গ্রাণ্ড ডিউক ডিমিট্রি ইতিমধ্যে ইউসাওপভের দিকে এগিয়ে এসেছেন। সব শুনে তিনিও চমকে উঠলেন। বললেন, আমার মনে হয় আর চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। রাসপুটিনকে বুঝতে দেওয়ারও দরকার নেই আমরা কি করতে চেয়েছিলাম! আজকের আসর বরঞ্চ ভেঙ্গে দিয়ে, চল যে যার বাড়ীতে চলে যাই।

পুরিশকোভিচ বললেন, পাগল নাকি! এতদূর এগিয়ে এখন পিছু হটবো! ওসব হবেনা। এস্পার ওস্পার যা হবার আজই হবে। বিষে যখন মরেনি গুলিতে মরবে।

তার কথা শেষ হতেই ডিমিট্রি বললেন, আমার কাছে রিভলবার আছে।

ইউসাওপভ বললেন, আমি যাবো মারতে।

রিভলভার হাতে ইউসাওপভ আবার রাসপুটিনের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। রাসপুটিনের তখন নেশা ধরে গেছে। অল্প

অল্প ঢুলছেন আর বিড় বিড় করে বলছেন, ওসব ধম্মটম্মো হল দিনের বেলার ব্যাপার। রাত্রে চাই মদ, মেয়েছেলে। জিপসী নেই এখানে? আহা জিপসীদের পেতে ইচ্ছে করছে এখন!

ইউসাওপভ রাসপুটিনকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্ত্তির দিকে। বললেন, মূর্ত্তিটা কেমন?

রাসপুটিন চোখ তুলে তাকালেন ক্রুশের দিকে।

ঠিক তখনই ইউসাওপভের হাতের পিস্তলের ট্রিগারে চাপ পড়ল। পর পর কয়েকবার গুলি করলেন তিনি, রাসপুটিনের পেছনে দাঁড়িয়ে। পিঠ ছেঁদা করে গুলি বেরিয়ে গেল। রাসপুটিন আর্ত্তনাদ করে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন।

গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে এলেন ডাক্তার ল্যাজোভার্ট, গ্র্যাণ্ড ডিউক ডিমিট্রি, পুরিশকোভিচ। রাসপুটিনের দিকে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার ল্যাজোভার্ট। খুব ভাল করে নাড়ি পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, সব শেষ।

ইউসাওপভকে মৃতদেহের কাছে রেখে বাকি চারজন ওপরে গেলেন অন্যান্য বন্দোবস্ত সেরে ফেলতে। কিছুক্ষণ পর ইউসাওপভ দেখলেন, রাসপুটিনের চোখ যেন খুলছে। প্রথমে বাঁ চোখ, তারপর ডান। দুটি চোখ একদৃষ্টে ইউসাওপভের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ রাসপুটিন উঠে দাঁড়ালেন। তার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বের হচ্ছিল। তিনি ইউসাওপভের কলার চেপে ধরলেন। কোনভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা দোতলার দিকে ছুটলেন ইউসাওপভ। ভয়ে, উত্তেজনায় সে তখন থর থর করে কাঁপছে।

ওপর থেকে পুরিশকোভিচ গলা পেলেন ইউসাওপভের—ও বেঁচে গেছে, পুরিশকোভিচ ও বেঁচে গেছে। পালাচ্ছে।

চিৎকার শুনে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন পুরিশকোভিচ। সিঁড়িতে দেখা হল ইউসাউপভের সঙ্গে। সে তখন ঘামছে, আর হাঁপাচ্ছে। পুরিশকোভিচ দেরী না করে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। দেখলেন রাসপুটিন সেলার পার হয়ে যাচ্ছেন ছুটতে ছুটতে। তার পেছন পেছন এসে দেখলেন, রাসপুটিন বাইরে বেরুবার দরজার সামনে পৌঁছে গেছেন। তার কানে এল রাসপুটিন বিড় বিড় করছেন,—ফেলিক্স, শেষকালে ফেলিক্স আমাকে হত্যা করতে চাইল! আমি সব বলে দেব জারিনাকে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমাদের মজা।

পুরিশকোভিচ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে লোকটি আধ ঘণ্টা আগে মারা গিয়েছিল সে আবার বেঁচে উঠল কি করে। ভাবার মত সময় হাতে ছিল না। বেরুবার দরজার কাছে রাসপুটিন পৌঁছুতেই পুরিশকোভের হাতের রিভলবার গর্জে উঠল পরপর তিনবার। রাসপুটিন থমকে দাঁড়ালেন। খুব সামনে থেকে পুরিশ-কোভিচ তার কপালে আবার গুলি করলেন। তারপর ছুটে গিয়ে রাসপুটিনের কপালে ধাই করে এক লাথি কষিয়ে দিলেন। রাসপুটিন পড়ে গেলেন। আবার ওঠার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। মুখ থুবড়ে পড়লেন। রক্তে তখন ভেসে যাচ্ছে তার শরীর।

ইউসাউপভ, ল্যাজোভার্ট সবাই ছুটে এসেছিলেন গুলির আওয়াজ পেয়ে। তাদের চোখের সামনে দেখতে দেখতে রাসপুটিনের দেহ স্থির হয়ে গেল। ডাক্তার ল্যাজোভার্ট আবার একবার দেখলেন নাড়ি পরীক্ষা করে। তারপর নীল কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুড়ে বেঁধে ফেলা হল রাসপুটিনের দেহ। বরফের মধ্যে আগে

থেকেই গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। পুরিশকোভিচ আর ডাক্তার ল্যাজোভার্ট ঠেলে ঠেলে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে দিলেন দেহটা।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আনা ভিরুবোভা ফোন পেয়েছিলেন রাসপুটিনের মেয়ের কাছ থেকে—বাবা কাল ইউসাভপভের গাড়ী করে রাত্রে চলে গেছেন। এখনও ফেরেন নি। চিন্তা হচ্ছে।

আনা খবর দিয়েছিলেন জারিনাকে, জারিনার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল। তখনই ফোন এল পুলিসের কাছ থেকে। তারা জানাল, আগের দিন গভীর রাতে ইউসাউপভের মইকা প্যালেসে গুলির আওয়াজ পাওয়া গেছে।

জারিনা ডেকে পাঠালেন প্রটোপোপোভকে। বলেছিলেন, তদন্ত করুন। দেখুন ব্যাপারটা কি।

তদন্ত শুরু হল। গুপ্তচরেরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ইউসাউপভের মইকা প্যালেসের মেঝেতে, মাটিতে রক্তের দাগ দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল।

ইউসাউপভ বললেন, এটা একটা কুকুরের রক্ত। কাল বড্ড ঘেউ ঘেউ করছিল। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। নেশার ঘোরে মেরে ফেলেছি ঐ যে দেখুন কুকুরটা পড়ে আছে।—দেখা গেল একটা কুকুর গুলিবদ্ধ হয়ে মরে আছে। ইউসাউপভ নিপুণভাবে সব কিছু সাজিয়ে রেখেছিলেন।

ডিটেকটিভরা যতই চেষ্টা করুন না কেন প্রথম দিন রাসপুটিনের কোন হদিশ পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় দিন আলেকজান্দ্রা নিঃসন্দেহ হলেন, রাসপুটিন আর বেঁচে নেই। তৃতীয় দিনে জানা গেল, তার আশঙ্কাই সত্যি। রাসপুটিন আর বেঁচে নেই। তার দেহের

সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। একটা গর্তের মধ্যে তার মৃতদেহকে ফেলে বরফ চাপা দেওয়া হয়েছিল। আরো জানা গেল, রাসপুটিনের মৃত দেহের হাত ওপরের দিকে তোলা, পাকস্থলিতে জল। জলে নিশ্বাস আটকে সে মারা গেছে।

ইউসাউপভ বিস্মিত হয়েছিলেন খবর শুনে। খুব ভাল করে বেঁধে কাপড়ে মোড়া হয়েছিল রাসপুটিনের দেহ। গর্তের মধ্যে বরফ চাপা দেওয়ার সময় ডাক্তার ল্যাজোভার্ট দেখেছিলেন সে মৃত। তবে তার হাতের বাঁধন সে কি করে খুলেছিল? কি করেই বা তার হাত মাথার ওপর তুলে আনতে পেরেছিল। মৃত মানুষের পেটে এত জলই বা কি করে যেতে পারে।

পেট্রোগ্রাডের ঘরে ঘরে সেদিন আনন্দ উৎসব। রাসপুটিনের মৃত্যুব খবরে তারা রাহুমুক্তির উৎসবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল।

রাসপুটিন জাবিনাকে বলেছিলেন, আমাকে যদি কেউ হত্যা করে তবে তার ছ'মাসের মধ্যে তুমি, তোমার ছেলেমেয়েরা, স্বামী কেউই বেঁচে থাকবেনা। রাসপুটিন নিকোলাসকে লিখেছিলেন, যদি আমার হত্যাকারী এমন কেই হয় যার ধমণীতে প্রবাহিত হচ্ছে রাজরক্ত, তবে আমার মৃত্যুর বছর দুয়েকের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন আপনি সপরিবারে।

রাসপুটিনের এই কথা তার মৃত্যুর পর আশ্চর্য্য ভাবে ফলেছিল। মাত্র তিনমাসের মধ্যে রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল বিপ্লবের বহ্নিশিখা। জার নিকোলাস নিশ্চিত অমোঘ নিয়তির দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। নিজের হাতে নিজের পদত্যাগের চিঠিতে তিনি সই করতে বাধ্য হয়ে-

য়ছিলেন উনিশশো ষোল সালের মার্চ মাসের পনের তারিখে। পরের দিন, ষোলই মার্চ বুঝতে পেরেছিলেন নিকোলাস—মুক্ত জীবনের দিন শেষ হয়েছে। এবার সময় এসেছে বন্দী জীবনের। নিকোলাস বুঝতে পারছিলেন, শেষের ঘণ্টা বাজছে। শেষ যাত্রা শুরু হয়েছে। এই যাত্রা থেকে কেউ কোনদিন ফিরে আসেনা।

উনিশশো ষোল সালের ষোলই জুলাই গভীর রাত্রে ইউরোভস্কির স-পরিবার জারকে ঘুম থেকে তুলে বলেছিলেন, নীচে চলুন সবাই। আপনাদের রাশিয়া থেকে পালানোর বন্দোবস্ত করেছি।

নিরাশার মধ্যে আশার ক্ষীন শিখা দেখে নেমে এসেছিলেন জার জারিনা—পুত্রকন্যাসহ। তাদের চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, একটু অপেক্ষা করুন বন্দোবস্ত হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরে ঢুকেছিলেন কয়েকজন। হাতে তাদের উদ্যত রিভলবার। ঠিক সেই সময়ই ঘরে ঢুকলেন ইউরোভস্কি, বললেন, দেরী নয়। স্টার্ট।

তার কথা শেষ হবার আগে জার হাত তুললেন। বোধহয় কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু বলা আর হলনা। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে গেল একসঙ্গে। পাশাপাশি গড়িয়ে পড়ল দেহগুলি। রাশিয়ার শেষ জার নিকোলাস, পরিবারের সকলের সঙ্গে কয়েকবার ছটফট করে রক্তধারার মধ্যে স্থিরচিত্রের মত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।